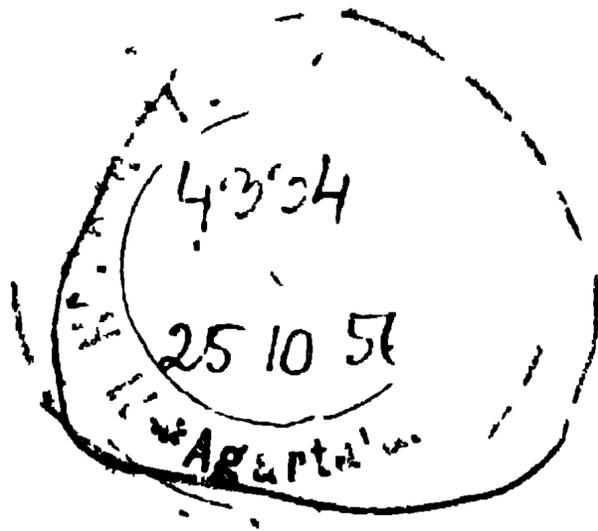


অসাধারণ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়



মিত্রালয়

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তিন টাকা

মিত্রালয়, ১০ নং আমাচরণ দে ষ্ট্রীট হইতে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত এবং মানসী
প্রেস, ৭৩ নং মালিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

স্বনামখ্যাত বন্ধু
ভারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
করকমলে

ত্রিশ বত্রিশের বেশি হইবে না। মেয়েটির পরনে তালিলাগানো শাড়ী, কিন্তু ময়লা নয়—মুখশ্রী একসময় বেশ ভালোই ছিল বোঝা যায়, দেহ খুব সম্ভবত অনাহারে ও ম্যালেরিয়ার শীর্ণ।

মেয়েটি বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিল—ও ডাক্তারবাবু—

সীতানাথ ডাক্তার উহাদের দিকে একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে চাহিয়া বলিলেন—কি চান?

—বাবু, একে একটুখানি দেখতি হবে।

সীতানাথ ডাক্তার বুঝিয়াছিলেন ইহাদের দ্বারা বিশেষ কোনো অর্থাগমের আশা নাই—যত বড় কঠিন অসুখই হউক না কেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত চেহারা। পরনে তো ওই কাপড়। মাথা তৈলাভাবে রক্ষ। রোগীর মধ্যে গণ্য করিয়া উৎফুল্ল হইবার কোনো কারণ নাই।

তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন—হয়েচে কি? মেয়েটি বলিল—হবে আর কি। ওঁর জ্বর ছাড়ে না আজ দু'মাস। তার ওপর মেহ। শরীর একেবারে ভেঙে দিয়েচে। আমার উনি ছাড়া আর কেউ নেই। আপনি দয়া করে দেখুন।...বলিয়া মেয়েটি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—সবে এসো এঁদিকে—

পরে রোগী পরীক্ষা করিয়া বলিলে—হঁ, দেখবো কি, এর মধ্যে অনেক রোগ। কদিন এমন হয়েচে?

পুরুষটি এবার ক্ষীণসুরে বলিল—তা বাবু অনেক দিন। আমি আজ তিন-চার মাস ভুগছি। আর এই কাশি, এ বিছুতি যাচ্ছে না—

মেয়েটি হাত তুলিয়া অর্ধৈর্ষ্যের সুরে বলিল—তুমি চুপ করো দিকিনি! খুব খ্যামোতা তোমার! আমার হাড় মাস জালিয়ে খেলে তুমি—তিন মাস ওঁর অসুখ—

তাহার পর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল—ওঁর কথা শোনবেন না। ওঁর

কি কিছু ঠিক থাকে ? নিজের দিকে ওঁর কোনো খেয়াল নেই—এই শুনুন তবে আমার কাছে—

কথাটা শোনাইল এভাবে যেন লোকটি দার্শনিক কিংবা কবি, অথবা ব্রহ্মদর্শী—সাংসারিক তুচ্ছ বিষয়ে স্বভাবতই ইনি অনাসক্ত। বোধ হয় ঈর্ষ্যা-প্রণোদিত হইয়াই সীতানাথ ডাক্তার পুরুষটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—তোমার গনোরিয়া হয়েছে কতদিন ?

—তা বাবু চার পাঁচ মাস হবে। সেবার যখন...মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া বলিল তুমি তো সব জানো কিনা ! চূপ করো। না বাবু, দু'বছর হয়ে গেল। আমার হাড় মাস ভাঙা করে খেলে ওই মিসেস। কি জ্বালায় যে পড়েছি আমি, মরণ হয় তো হাড় জুড়িয়ে যায় আমার।

কাহার মরণ হইলে তাহার হাড় জুড়ায়, কথার ভাবে ঠিক ধরিতে পারিলাম না।

সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—বাড়ী কোথায় ?

মেয়েটি বলিল—বাড়ী এই ঝিটকিপোতায়। আমরা হাড়ি।

—ও ! ঝিটকিপোতায় হাড়ির বাস আছে নাকি ?

—না বাবু, দেশে দেশে ভেসে বেড়াচ্ছি এই গুনারে নিয়ে। বিয়ে করা সোয়ামী, ফেলতে তো পারিনে। আজ দুটি বছর উনি বিচ্ছেনেয় পড়ে। উঠতি হাঁটতি পারেন না। কত অসুস্থ বিষুদ করলাম আমাদের দেশে ঘরে, যে যা বলে তাই করি, কিন্তু কিছুতেই সারাতি পারলাম না, দিন দিন যেন মানুষ উঠতি পারে না, খেতি পারে না। তাই আজ বলি—ডাক্তার বাবুর কাছে নিয়ে যাই—একটু দেখুন আপনি ভাল করে, আমার আর কেউ নেই—

আমি এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম। এইবার বলিলাম—তোমার স্বামী কি কাজ করে ?

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—কাজ ! ওরে আমার কাজের শিরোমণি রে ! ও করবে কাজ ? সেদিন পূবের সূর্য পশ্চিম পানে ওঠবে না ?

পুরুষটি লজ্জিতভাবে বলিল—না বাব, কাজ আমি করিনে। সে ক্ষ্যামতা নেই তো করবো কি। ও-ই ধান ভেনে দাইগিরি করে সংসার চালায়। তা এই বাজারে বড্ড কষ্ট হয়েছে বাবু।

মেয়েটি বলিল—তুমি থামবে বাপু, না বকে যাবে? বাবু শুনুন তবে বলি। কষ্ট দুফুর বার্তা ও কি জানে। সংসারের কোন খোঁজ রাখে ও?

কৃতজ্ঞতার আবেগ বোধ হয় অসংবরণীয় হইয়া উঠিল পুরুষটির। সে পুনরায় নম্রস্বরে বলিল—তা যা বললে ও সে কথা সত্যি বটে। ও আমাকে জানতি ছায় না। নিজি সব করবে। আমি তো খাটতি পারিনে—আমার এই ডান পাডা একটু খোঁড়া, হাঁটতি পারিনে—এই দেখুন বাবু এই পাডা—

মেয়েটি আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—নাও, আর বাবুদের সামনে তোমার পা বার করতি হবে না—

কিন্তু দেখিলাম মেয়েটির চোখ ছল ছল করিয়া উঠিয়াছে। এই গনোরিয়া-গ্রস্ত খোঁড়া অকর্মণ্য বৃদ্ধের প্রতি এতটা দবদ ওর। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—তুমি ধাইয়ের কাজ জানো বললে না?

পুরুষটি এ-কথার উত্তর দিল। বলিল—খুব ভাল ধাই! তা যে বাড়ী যাবে, এক কাঠা করে চাল, একখানা করে কাপড়, একটি করে টাকা—ও-ই খরচ করে আমায় চিকিচ্ছে করাচ্ছে বাবু।

মেয়েটি উহাকে থামাইয়া বলিল—তুমি চুপ করো দিকিনি! তুমি কি জানো ও-সবের। বাবু, ধাইয়ের রোজগার আগে চলতো ভালোই। এখন আপনাদের এখানে হাঁসপাতাল হরেছে পোয়াতিদের জন্তি। সব লোক এখানে আসে। আমাদের কাছে কেডা যাবে? ধান ভেনে যা হয়। দু'মণ ধান ভানলি পাঁচ-কাঠা চাল পাওয়া যায়—কিন্তু বাবু, অসুখে ভুগে ভুগে আমার গতির গিয়েছে, আর তেমন খাটতি পারিনে। ধান ভানা বড্ড খাটুনির কাজ। যেদিন ধান ভানি, আজকাল রাত্তিরি বড্ড পা কামড়ায়—

আমি বলিলাম—তোমার কে কে আছে আর ?

মেয়েটি সাফ উত্তর দিল—যম ।

—জাতে হাড়ি বুলে না ?

—হ্যাঁ বাবু ।

—ঝিটকিপোতা থেকে এলে কি করে ? সে তো অনেক দূর ।

—নৌকো করে এ্যালাম বাবু ।

—ভাড়াটে নৌকো ?

—অনেক কেঁদে হাতে পায়ে ধরে তেরো গণ্ডা পয়সা ঠিক হইল । ওই আমাদের গাঁয়ের রতন মাজি । আমি তাকে ধরম বাপ বলে ডেকেছি ।

—ধানের চাষ কর ?

—না বাবু, ঘর-দোর নেই তার ধানের জমি । কিছুলির ছাউনি একখানা ঘর, তা এবার খসে পড়ছে । না খুঁটি দিলি এবার বর্ষায় সে ঘরে থাকা যাবে না ।

বেলা হইয়াছিল । সেদিন চলিয়া আসিলাম । ইহার পর হইতে প্রায়ই দুদিন অন্তর মেয়েটি উহার স্বামীর হাত ধরিয়া ডাক্তারখানায় হাজির হয় । কখনো শ্রুতধের দাম কমাইবার জন্য সীতানাথ ডাক্তারের হাতে পায়ে পড়ে, কোনোদিন স্বামীর সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন কবে, কবে বোগ সারিবে, নৌকা ভাড়া দিয়া আর পারে না সে—ইত্যাদি ।

দেখিয়া শুনিয়া সীতানাথ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওকে কেমন দেখেন ? ওর রোগ সারবে ? সীতানাথ ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—বিশ্বাস তো হয় না । নানান উপসর্গ । ওর শরীরে কিছু নেই—তবে চেষ্টা করছি, এই যা ।

অবশ্য উহাদের সাক্ষাতে একথা হয় নাই ।

মাসখানেক পরে একদিন ডাক্তারখানায় বসিয়া আছি, মেয়েটি আরও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে । আর কিছুদিন এমনধারা চলিলে ইহারই চিকিৎসার প্রয়োজন

হইবে। হয়তো নিজের আধপেটা খাইয়া স্বামীর ঔষধপথ্য ও নৌকাভাড়া জোগাইতেছে। পরনের বস্ত্রও জীর্ণতব হইয়া উঠিয়াছে। সেদিনের কাজ শেষ করিয়া তাহারা যখন চলিয়া যায় তখন মেয়েটিকে ড কিবা বলিলাম—শোনো এদিকে!

—কি বাবু?

—ধাইয়ের কাজ করতে পাববে?

সে হাসিয়া বলিল—ঐ কাজই তো কবি বাবু। তা আর পারবো না?

আমি উহাদের সঙ্গে রাস্তায় বাহিব হইয়া পড়িলাম। উদ্দেশ্য আমার বাসাটা তাহাকে চিনাইয়া দেওয়া। সে মাসেই আমার বাসাতে ধাত্রীব প্রয়োজন উপস্থিত হইবে। পথে মেয়েটি বলিল—দিন না বাবু একটা কাজ জুটিয়ে। বহু কষ্টে পড়িচি এনাকে নিয়ে। এক এক শিশি ওষুধ পাঁচ সিকে দেড টাকা। আমার রোজগার বড় মন্দা হয়ে গিয়েচে। আব চালাতি পাবচি নে। দিন একটা জুটিয়ে, যা দেবে তাই নেবো। এক কাঠা চাল, একখানা কাপড়, আব না হয় আট আনা পদ্মসা দেবে—তাই নেবো। আমাব খাঁই নেই বাবু অগু ধাইয়ের মত। তা বাবু আমি বাস্তিরি আঁতুড়ে থাকবো, সেক তাপ কববো, ছাড়া কাপড় কাচবো—

অনুনের সুরে বলিল—দিন একটা কাজ জুটিয়ে—

আমি বলিলাম—ওই আমাব বাসা। আর দিন আটেক পরে আমাব বাসাতে দরকার হবে ধাইয়ের। চলো আমার সঙ্গে, দেখিয়ে আনি। ওকে এখানে বসিয়ে রাখো। পুরুষটিকে বলিলাম—তুমি এই গাছতলায় ছায়ায় বসে থাকো, বুঝলে?

বাড়ীতে আনিয়া ধাইকে দেখানো হইল। কিন্তু বাড়ীতে ও ধাই পছন্দ হইল না, অজুহাত অবশ্য পাড়াগাঁয়েব অশিক্ষিতা ধাই, উহাদের কি জ্ঞান আছে—ইত্যাদি। কিন্তু আমার সন্দেহ হইল আসল কারণ মেয়েটি দেখিতে ভালো এবং আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি বলিয়া।

পরদিন আবার রাস্তায় দেখা তাহাদের সঙ্গে। ডাক্তারখানায় হুঁজনে চলিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া মেয়েটি ডাকিয়া বলিল—ও বাবু, শুনুন—

আমি তাহার কিছু না করিতে পারিয়া লজ্জিত ছিলাম। বলিলাম—
বলো—

—আপনার বাড়ীতে হোলো না?

—ইয়ে—না—ওদের সঙ্গে কমলা ধাইয়ের কথাবার্তা আগেই হয়ে গিয়েচে
কি না? তাই—

—যাক্ গে বাবু। আপনি ঠগ এক জায়গায় জুটিয়ে দিন না?

—দেখবো। আরও এক জায়গায় সন্ধান আছে আমার।

—দেখুন। তিনিই দয়া করবেন। চরিতামৃত প্রভু বলেচেন—

হাড়ির মেয়ের মুখে এ-কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম—তুমি
চৈতন্যচরিতামৃত পড়? লেখাপড়া জান নাকি?

পুরুষটি বলিল—ও জানে।

—বইখানা আছে নাকি তোমাদের বাড়ী?

—আছে বাবু, ও রোজ পড়ে অমোকে শোনায়। বই পড়ে আর কাঁদে।

মেয়েটি সলজ্জ প্রতিবাদের স্বরে বলিল—তোমার অত ব্যাখ্যানা করতি হবে
না, চুপ কর। না বাবু, ওর কথা শোনবেন না। পড়ি একটু একটু সন্দে
বেলাডা। তা ও বই পড়ে বোজবার মত অদেষ্ট কি আমাদের আছে বাবু?

—লেখাপড়া শিখলে কোথায়?

উহার স্বামী বলিল—ওর মামার বাড়ী ছেল ধরমপুকুর। শূয়োরের ব্যবসা
ছিল মস্ত। অবস্থাও ছিল ভালো। এখন তাদের কেউ নেই, মরে হেজে
গিয়েচে—নইলে আজ এমন দুর্দশা হবে কেন ওর বাবু? ও ছেলেবেলায়
মামাদের কাছে থেকে ইস্কুলি নেকাপড়া করেল।

—কি ইস্কুল ?

বৌটি ইহার উত্তর দিল, কারণ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পুরুষটির সাধ্যাতীত ।
অতি জটিল প্রশ্ন ।

—অপার প্রাইমারি ইস্কুল বাবু ।

—পাশ করেছিলে ?

—হঁ । এখানে এসে পরীক্ষা দিয়ে গিইছিলাম ।

উহার স্বামী সপ্রশংস মুগ্ধ-দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—বাবু,
ও পাশ করে ছটাকা ইস্কলাসি পেয়েল ।

বৌ ধমক দিয়া উঠিল—তুমি চুপ কবো দিকিনি ।

পুরুষটি তখনও ঝোঁক সামলাইতে পারে নাই । বলিল—বাবু, আমাব সঙ্গে
বিয়ে হয়ে আর নেকাপড়া হোল না ওর । মামারাও মরে হেজে গেল । ও যেমন
মেয়ে, আমার হয়েছে সেই যাবে বলে—বানরেব গলায় মুক্তোর মালা । সব
অদেষ্ঠের ফল আর কি । আমি ওরে খেতি দেবো কি, আমি অসুখে পড়ে
পঙ্কস্ত ওই আমারে খেতি দ্য,য । আমাব এই চিকিচ্ছেপত্তর ওই সব চালাছে ।
আজকাল তেমন রোজগার নেই ওর—পেট ভরে ছটো খেতিও পাষ না - আমারে
বলে, তুমি সেরে উঠলি আমার—

বৌ আবার কড়া ধমক দিয়া উঠিল—আবার ! বাবুব সামনে ওই সব কথা ?
চলো বাড়ী তুমি - ঝাঁটা মারবো তোমার মুখি—তোমার খুব মুরোদ !...মুবোদের
আবার ব্যাখ্যানা হচ্ছে—লজ্জা করে না তোমার ?

আমি মধ্যস্থতা করিয়া বাললাম—কেন, ও তো ভালোই বলচে । ওর যা
ভাল লেগেচে, ভাল বলবে না ?

বৌ সলজ্জ সুরে বলিল—না বাবু, যেখানে সেখানে ওসব কথা কে বলতে
বলেচে ওকে ?

—তা বলুক । কোনো দোষ হয়নি ।

—বাবু, আমারে দেন একটা কাজ জুটয়ে—

—চেষ্টা করবো। একটু অপেক্ষা করো, দেখি দু-একদিন।

—কাজ না পেলি বড্ড কষ্ট হচ্ছে। ধান ভানতি শরীর আর বয় না। দু-মণ করে ধান না ভানলি এই যুদ্ধের বাজারে দুটো লোকের খাওয়া হয়? তাও বাবু শুধু খাওয়া। পরা এ থেকে হয় না। একখানি কাপড়ে ঠেকেচে। একটা আঁতুড়ের কাজ জুটলি তবু একখান কাপড় পাবো।

কয়েকদিন ধরিয়া তাহাদের আর 'দেখিলাম না। কাজও কিছু জুটাইতে পারা গেল না। কাহার বাড়ীতে কে অন্তঃসত্ত্বা আছে এ সংবাদ জোগাড় করা আমার কৰ্ম নয় দেখিলাম।

এই সময় মহাস্তর শুরু হইয়া গেল। চাউলের দাম আগুন হইয়া উঠিতেছে দিন দিন। আমাদের এই ক্ষুদ্র টাউনের আশপাশের পল্লীগাম হইতে দলে দলে ক্ষুধার্ত নরনারী হাঁড়ি ও মালসা হাতে ফ্যান ভিক্ষা করিবার জন্ত ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল, ফ্যানও অমিল। দশবিশ সের ফ্যান কোন গৃহস্থ-বাড়ীতে থাকে না, যাহা আছে তাহা প্রথম মহড়াতেই ক্ষুধা ক্লিষ্ট নরনারীদের মধ্যে বিলি হইয়া যায়—একটু বেলায় যাহারা আসে, তাহাদের শুধু হাতে ফিরিতে হয়। লোক দু-একটি করিয়া মরিতে শুরু করিল ইহাদের মধ্যে। টাউনের বুণ্ডু বাবুরা ও দাঁ বাবুরা প্রতিদিন একশত দেড়শত লোককে খিচুড়ি খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু অর্দ্ধোজঙ্গ, অনশনক্লিষ্ট, দিশাহারা নরনারীদের সংখ্যার তুলনায় তাহা নিতান্তই অল্প। ইহার মধ্যে আবার ত্রিপুরা জেলা হইতে বহু নরনারী আসিয়া কোথা হইতে জুটিল, তাহাদের কথা ভাল বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া যে গৃহস্থের দোরে যায়, তথা হইতে তাহারা বিতাড়িত হয়, কোথাও তাহারা তেমন সহানুভূতি পায় না।

এই মহাদুর্ভোগের হিড়িকে কত লোককে তলাইয়া যাইতে দেখিলাম।

কতবার মনে ভাবিয়াছি ওই মেয়েটির কথা। ধান ভানিয়া রুগ্ন স্বামীর চিকিৎসা চালাইত। নৌকো ভাড়া করিয়া হাত ধরিয়া লইয়া আসিত ডাক্তারখানায়। চৈতন্যচরিতামৃতের কথা বলিত। তাহাদের আর পথে ঘাটে দেখি নাই অনেকদিন। সীতানাথ ডাক্তারকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম। সীতানাথ বলিলেন—না, তারা অনেকদিন আসেনি। আর আসবে কি, এই তো কাণ্ড। ওধের দাম দিতে পারে না—ক'শিশি ওয়ুধের দাম এখনো বাকি। অনেকদিন উহাদের দেখি নাই। প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছি।

ভাদ্রমাসের দিকে আমাদের মহকুমার রিলিফ কমিটির যত্নে লঙ্গরখানা খুলি হইল। সেখানে প্রত্যহ বহু হুঃস্থ নরনারী লঙ্গরখানার খিচুড়ি খাইতে আসিত। উহাদের মধ্যে একদিন আবার মেয়েটিকে দেখিলাম। একটা মালসায় করিয়া লঙ্গরখানার খিচুড়ি লইয়া কোথায় যাইতেছে।

আমি ডাকিয়া বলিলাম—তুমি কোথায় এসেছিলে ?

আমায় দেখিয়া সে লজ্জিত হইল।

বলিল—এই—

—তোমার স্বামী কোথায় ?

—ওই পুরানো ডাকঘরের পেছনে বটতলায়। আজকাল হাঁটতি পারে না মোটে।

—চলো দেখে আসি।

কৌতূহল হইল দেখিবার জন্য, তাই গিয়াছিলাম। গিয়া মনে হইল না আসিলে আমাকে বড় ঠকিতে হইত—কারণ যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা সচরাচর চোখে পড়ে না।

পুরানো পোষ্টাফিসের পিছনে যেখানে গবর্ণমেন্টের কলেরা ওয়ার্ডের ঘর, তার সামনে বটতলায় এক ছেঁড়া চাটাই পাতিয়া বৌটির খোঁড়া স্বামা শুইয়া আছে। মনে হইল লোকটা চাটাইয়ের সঙ্গে মিশিয়া আছে এত রুগ্ন। মেয়েটি তার

পাশে বসিয়া লঙ্গরখানার খিচুড়ি তাহাকে খাওয়াইতেছে। দুপুর বেলা। রাস্তা দিয়া অনেক লোক যাতায়াত করিতেছে, কেহ চাহিয়া দেখিতেছে, কেহ দেখিতেছে না। খাওয়ানো শেষ হইলে সে কলেরা ওয়ার্ডের কম্পাউণ্ডের টিউবওয়েল হইতে শতছিন্ন শাড়ীর আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া স্বামীর মুখে নিংড়াইয়া দিল। লোকটা হাঁ করিয়া ছুঁটোক জল গিলিয়া বলিল—আর একটু খাবো—

মেয়েটি আবার গেল টিউবওয়েলের কাছে, আবার শাড়ীর আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া ওর মুখে দিল। আমি কখনো এমন দৃশ্য দেখি নাই।

বলিলাম—অমন করে জল আনচো কেন ?

মেয়েটি বাঁ হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল—ঘটি বাটি কিছু নেই। কিসে জল আনি ?

—কেন মালসাটা ?

সে মালসাটা তুলিয়া আমার কাছে আনিয়া দেখাইল। বলিল—সবটা খেতে পারেনি। আধ মালসা রয়েচে। রাত্তিরে দেবো। খাওয়া কমে গিয়েচে একেবারে।

তারপর মালসাটা যথাস্থানে রাখিয়া আসিয়া বলিল—বড্ড কষ্ট হয়েছে বাবু—দিন না একটা কাজটাজ জুটিয়ে ? এককাঠা চাল শুধু—খুব কমের মধ্যে কড়ে দেবো—

এই তাহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ।



নদীর ধারের বাড়ি

শ্রামলীদের বাসা ছিল পীতাম্বর লেনে । দু'নম্বর পীতাম্বর চৌধুরীর লেন ।
সেকালে পুরনো বাড়ি, দোতলার ছ'টি ঘরে ছ'টি পরিবারের বাস । কলতলায়
দুটিবেলা সমানে ঝগড়া চলে জল তোলা নিয়ে । শ্রামলী ওর মধ্যে একটু
দেখতে ভালো, বয়েস ত্রিশের সামান্য ওপরে, দু'এক বছর ওপরে । চার
সন্তানের মা, দুটি মেয়ে, দুটি ছেলে ।

বেলা দশটা বাজে ।

শ্রামলীর স্বামী খেতে বসেচে । শ্রামলী ডালের বাটিতে হাত ডুবিয়ে সামনে
বসে আছে ।

শ্রামলী বলে -- ফিরবে কখন ?

শ্রামলীর স্বামীর নাম যদুনাথ ভট্টাচার্য্য । যদুনাথ একটা সওদাগরি আফিসে
সত্তর টাকা মাইনের চাকুরী করে । যুদ্ধের বাজারে তাতে চলে না । খাওয়া
দাওয়ার অসীম কষ্ট । ছেলেমেয়েগুলো দুধ খেতে পায় না ; দুটো শুকনো মুড়ি
চিবোয় স্কুল থেকে এসে ।

যদুনাথ বলে—ফিরতে সাতটার পরে ।

—আর একটা বাড়ি চাখো, বুঝলে ?

—সে তো বুঝলাম, বাড়ি মিলচে কই ? খুঁজতে কি কম করচি ?

—এ বাড়িতে আর টেকা যায় না ।

—কালও ঝগড়া হয়েছিল ?

—কবে না হয় ? বিশেষ গিন্নির সঙ্গে মতির মা'র ঝগড়া কালও খুব ।

অভয়ার সঙ্গে রাম বাবুর বোয়ের ঝগড়া ।

—জল তোলা নিয়ে ?

—তা আবার কি নিয়ে ? ও তো রোজকার ঘটনা লেগেই আছে । রোজ রোজ এ ইতরুমি আর ভালো লাগে না । অসহ হয়ে উঠেচে ।

যত্নাথ চলে গেল । শ্রামলীর ছেলমেয়েরা খেয়ে দেয়ে স্কুলে চলে গিয়েছিল ; ছেলে দুটিই বড়, তারা হাই-স্কুলে পড়ে । মেয়ে দুটি পড়ে মোড়ের কর্পোরেশন স্কুলে । ছোট রান্নাঘর, একটি লোক কার্বেশে ব'সে দুটি আহাৰ করতে পারে । আজ ন'টি বছর এ বাসায়, বড় মেয়ে লীলার বয়েস । এই বাসাতেই লীলার আঁতুড় হয়েছিল । রান্নাঘরের সামনে খোলা ড্রেনে তরকারির খোসা, ফেন, শাকের ডাটা, চিংড়ি মাছের খোসা জমে দুর্গন্ধ বার হচ্ছে । এই দুর্গন্ধ আর এই কুশ্রী দৃশ্য আজ ন'বছর ধরে সহ করতে করতে নাক অসাড় হয়ে গিয়েচে, এখন আর দুর্গন্ধকে দুর্গন্ধ বলে মনে হয় না ।

বীণা ওপরের তলার মনোরঞ্জন বাবুর মেয়ে । সে শ্রামলীকে ভালবাসে । কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলে—কাকিমা কি রাখলে ?

—মুসুরির ডাল আর চচ্চড়ি ।

—মাছ আনেননি কাকাবাবু ?

—নাঃ । ছটাকা চিংড়ি মাছের সের । মাছ আর কি কেনবার জো আছে ? উনি গিয়ে ফিরে এলেন ।

—এবার রেশনের চালে কঁকর খুব কম, কাকিমা । আপনারা রেশন আনেন নি ?

—বুধবার আসবে রেশন । এখনো আনা হয়নি । তোমার কাকা যেতে সময় পান নি ।

বিকলে কলে জল আসতেই ওপরের ভাড়াটে গিন্নিরা বড় এক এক বালতি ঘড়া বসিয়ে দিলেন কলের মুখে । একজন একটা তুলে নিয়ে যায় তো আর একজনে একটা বসায়, এইজন্তে চৌবাচ্চায় মোটে কয়েক ইঞ্চির বেশি জল জমতে পায় না । গা ধোবার কি কষ্ট বিকলে ! এই গুমট গরমে নিধ জলে

জান করতে পারলে কি আনন্দই পাওয়া যেতো। কিন্তু তা হওয়ার জো নেই। এক একজন ছোবড়া আর সাবান নিয়ে নামবে ওপর থেকে, আধ ঘণ্টা ধরে থাকবে। প্রথমে নামবে অভয়া, তারপর নামবে মতির দিদি, এরা দুজনেই ভীষণ বাগড়াটে। যতক্ষণ তারা কলতলায় গা ধোবে, ততক্ষণ কলে এক ঘটি জল কারো নেবার জো নেই—তাহলেই বাধবে ধুন্দুমার বাগড়া।

অভয়া বাঙাল দেশের মেয়ে। বেশ সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। শ্রামলীকে ডেকে বললে—ও দিদি, কি হচ্ছে ?

—কুটনো কুটচি ভাই।

—কি কুটনো ?

—ঝিঙে আর চেঁড়স। আনু তো বারো আনা সের উঠেচে ! আমাদের সাধ্যতে কুলোলে তো কিনবো !

—রেশন এসেচে ?

—না ভাই, বুধবারে আসবে।

—আমায় আধপোয়া চিনি দিতে পারবে দিদি তোমাদের রেশন থেকে ?

—আমুক আগে, দেখবো এখন।

এদের মধ্যে সবাই সমান অবস্থার মানুষ। কেরাণীর বৌ। পরম্পরের সঙ্গে বাগড়া ঘন্ব করে এদের দিন কাটে। পান থেকে চুগ খসলেই আর নিস্তার নেই। বিশ্বাস গিন্নি দলের মোড়ল, ওপরের ভাড়াটেদের সর্দার। তিনি সকলের হয়ে বাগড়া করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর সর্দারিতে ওপরের মেয়েরা কোমর বাঁধে, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে এই অভয়া। দেখতে সুন্দরী হলে, কী হবে, যেমনি স্বার্থপর তেমনি কুটিল মন। এই যে বললে চিনি দিতে হবে, ‘না’ বললে আর রক্ষে আছে ? কোন্ কালে এক বাটি ছুন ধার দিয়েছিল, সেই ঘটনার উল্লেখ করে খোঁটা দিয়ে বলবে বরিশালের টানে—আমরা কি কোনদিন কিছু কাউকে দিই না কি ! সময়ে অসময়ে ছুন রে তেল রে—তা নিয়ে মনে

থাকবে ক্যানো ? ঘোর কলি যে ! কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরলে পাজি —আচ্ছা আমরাও কি আর কখনো কাজে লাগবো না। তখন যেন— ইত্যাদি।

এই বাসাটাতে কি গুমট গরম। দক্ষিণ দিক চাপা, এতটুকু হাওয়া আসে না, প্রাণ আইটাই করে গরমে। আজ ন' বছর কষ্টভোগ চলচে। এই ঝগড়ার আবহাওয়া আর এই দাকগ স্থানাভাব। সকলের ওপরে এই অপরিষ্কার, নোংরা পরিবেশ। সবাই সমান অশিক্ষিতা, ভালো বল্লেও এ বাড়িতে মন্দ হয়। সেদিন অপরাধের মধ্যে ও শশীবাবুর স্ত্রীকে বলেছিল—দিদি, চিংড়ি মাছের খোসাগুলো একেবারে সামনেই ফেললে, কলতলায় সকলেরই যেতে আসতে হয়—সকলেরই তো অসুবিধে।

আর যাবি কোথায় ! শশীবাবুর বৌ চীৎকার জুড়ে দিলে—আমি কি একলা ফেলি নাকি, সবাই তো ফেলে, কেনই বা না ফেলবে ; ভাড়া দিয়ে সবাই বাস করে, কারো একার সম্পত্তি তো নয় ; সবাইই সুবিধে এখানে দেখতে হবে— যদি তাতে অসুবিধে হয় তবে গরীব ভাড়াটেদের সঙ্গে বাস করা কেন, তাহলে দোতলা বাড়ি আলাদা ভাড়া নিয়ে বালিগঞ্জ গিয়ে বাস করলেই তো হয়— ইত্যাদি।

শ্রামণীও চুপ কবে থাকবার মেয়ে নয়, সে বল্লে—দিদি, কি পাগলের মত বকচেন ? আপনি চিংড়ি মাছের খোসা ফেলবেন তাতে কেউ বারণ করচে না, তবে আমারই রান্নাঘরের সামনে কেন ফেলবেন ? কেন আমি তা ফেলতে দেবো ?

—ফেলতে দেবে না তোমার কথায় ? কি তুমি এমন লাট সায়েব এয়েচ রে বাপু। তুমি পাগল না আমি পাগল ? রান্নাঘরের বাইরের জায়গা তোমারও যা, আমারও তা—তুমি বলতে আসবার কে ?

—তা বলে পরের স্মৃতিতে অস্মৃতিতে যারা না দেখে তারা আবার মানুষ ?
তাদের আমি ঘোর অমানুষ বলি ।

এই পর্য্যন্ত গেল সাধারণ ভাবের কথা, একে ঝগড়া বলে অভিহিত করা যায় না । এরপর বাধলো আসল ঝগড়া যার নাম—। শ্যামলীও ছাড়লে না, শশীবাবুর বৌও না—উভয়পক্ষে বাধলো কুরুক্ষেত্র । তারপরে কথা একদম বন্ধ হয়ে গেল দু'পক্ষেই । নানারকম শক্রতা আরম্ভ করলেন শশীবাবুর প্রৌঢ়া স্ত্রী । ছেলেমেয়ের হাত ধরে খোলা ড্রেনে বসিয়ে দিতে লাগলেন সকালবেলা, পায়খানা থাকা সত্ত্বেও । প্রায় শ্যামলীর রান্নাঘরের সামনেই । কিছু বলবার জো নেই । ওই আর গোলমাল । একটি মাত্র পায়খানা নিচে । মেয়ে পুরুষ তাতে যাবে । কি নোংরা করেই রাখে মাঝে মাঝে । ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে যদি ঘুম ভাঙে, তবে কল পায়খানা ব্যবহার করা যাবে সেদিন, নয়তো বেলা এগারোটা, পুরুষরা সবাই আফিসে বেরিয়ে গেলে । চৌবাচ্চায় তখন দু'ইঞ্চি মাত্র ডল থাকে কোনোদিন, কোনোদিন তারও কম ।

শ্যামলীর দম বন্ধ হয়ে আসে । ..

এমন কি কোনো বাসা পাওয়া যায় না যাতে অন্তত মেয়েদের একটা আলাদা নাইবার জায়গা আছে ? ...

আষাঢ় মাসের প্রথম ।

ফিরিঙালা গলির মধ্যে হাঁকচে—চাই ল্যাংড়া আম—ল্যাংড়া আ-আ-ম— ।
বৃষ্টি এখনও নামেনি এবার । জৈষ্ঠ্য মাসের গরম প্রায় সমান ভাবেই চলচে ।
মতির ছোট বোন এসে বললে—দশ পলা তেল ধার দেবেন কাকিমা ?

শ্যামলী বললে—হবে না । তেল নেই ।

— আট পলাও হবে না ?

— কিছু নেই ।

মেয়েটা চলে গেল । শ্রামলী তেল দেবে কি, ওদের কোন আক্কেল নেই । শ্রামলী কি সাথে বিরক্ত হয়েছে ? উনি খারাপ কলের তেল খেতে পারেন না বলে একনম্বর কানপুর কিনে আনেন ওঁর আফিসের রেশন বেচে । সে কী বাঁজওয়ালা তেল । মতিরা এক কৌশল ধরেছে কি, বিশ পলা সেই ভালো তেল হুয়ায় ধার নেবে, আর ধার শোধ দেবে পাঁচ সিকে সেরের কলের তেল দিয়ে । উনি বলেন, ও তেল খেলে বেরিবেরি হয় । শ্রামলীদের ফি হুয়ায় বিশ পলা তেল অপব্যয়ে যায় ।

ওরা চালাক আছে । একবার নেবে দশ পলা, তারপর আর একদিন এসে নেবে দশ পলা । এক সঙ্গে নেবে না । একেবারে যেন মৌরসী পাট্টা করে বসেছে । দেবো না তেল, রোজ রোজ ও চালাকি খাটবে না আমার কাছে । দেখি কি হয় ।

কিন্তু মতির মায়ের কৌশল অগ্ররকম । সে এতটুকু চটলো না, আবার একবার বাটি হাতে এসে হাজির স্বয়ং মতির মা ।

—ও শ্রামলী, দে দিকি ভাই একটু তেল ।

—তেল নেই দিদি ।

—দিভেই হবে । মাছ ভাজা হচ্ছে না, পাঁচ পলা তেল দে—

—যা আছে আমারই কুলোবে না দিদি—

—দেখি তোর তেলের বোতল ? দে ভাই আমায় পাঁচ পলা—

অগত্যা শ্রামলী উঠে গিয়ে তেল দেয়, ও আবার পরের কাঁছনি মিনতি বেশিক্ষণ সহ করতে পারে না । ঠকচেই তো দেখাই যাচ্ছে, ঠকুক । লোকে তাতে খুশি হয় হোক ।

কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে দোতলার ভাড়াটীদের মধ্যে মহা ঘোঁটা-

মঙ্গলের সৃষ্টি হোল। মতির মা গিয়ে সাতখানা করে লাগিয়েচে তাদের কাছে। তেল থাকতেও দিতে চাচ্ছিল না, বোতল দেখতে চাইলুম, তাই তো দিলে। এমন ছোট নজর তো কখনো করতে পারিনি আমরা। এই যে সেদিন বোশেখ মাসে গুঁর পেটের ব্যথা ধরলো রাত্তিরে, য়ুবাৰু সোডা চেয়ে নিয়ে যান নি আমাদের এখান থেকে। দিই নি আমবা? লোকের কাছে হাত পেতে যেমন নিতে হয়, তেমনি দিতেও হয়। তবে লোকে মানুষ বলে।

তার পরের দিন আর কলতলায় যাওয়া যায় না। বড় বড় বালতি, ঘড়া আর টব পড়লো একের পর এক সকাল থেকে। সে সব সরিয়ে এক বালতি রান্নার জল নিতে গেলেও বাগড়ায় মুখর হয়ে উঠবে সারা বাড়িটা—সেকথা শ্যামলী ভাল রকমেই জানে। অনেকবারের অভিজ্ঞতায় জানে। স্মৃতরাং আষাঢ় মাসের গুমট গরমে বেলা এগারোটা পর্যন্ত তাকে অস্নাত অবস্থায় থাকতে হোল। এগারোটার পর কলের জল কখন চলে গেল। যখন সে নাইতে গেল, তখন চৌবাচ্চায় ইঞ্চি চারেক মাত্র জল। কাকের মুখ থেকে তার মধ্যে পড়েচে ভাত।

এই সময়ে একদিন য়ুবাৰু এসে বলেন, ওগো শোনো, একটা সন্ধান পেয়েচি। রাণাঘাট থেকে নেমে যেতে হয় প্রায় এগারো মাইল উত্তরে, বল্লভপুর বলে পাড়াগাঁ। সেখানে কলকাতার এক বড় লোকের জমিদারী কাছারি ছিল, বিক্রি করে ফেলেচে। জমিদারি বিক্রি হয়ে গিয়েচে, কাছারি বাড়িটাও ওরা আলাদা বিক্রি করবে। মাঝে মাঝে যেতো বলে কাছারিবাড়ির সংলগ্ন দোতলা বাড়ি তৈরি করেছিল, ওপরে নিচে পাঁচখানা ঘর, দারান্দা, রান্নাঘর, নাইবার ঘর সব আছে। দশ বিঘে জমির ওপর কাছারিবাড়ি, তাতে আম কাঁঠালের গাছ, কলাগাছ আছে। বাড়ির সেই জমির নিচে দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে যাচ্ছে। তাতে জমিদার বাধানো ঘাটলা করে দিয়েচেন, বাড়ির মেয়েরা যখন গিয়ে থাকতো, তাদের নাইবার সুবিধার জন্তে। সদস্যক তিন হাজার সাড়ে তিন

হাজার টাকা হোলে বাড়িটা পাওয়া যায়—জমিগুদু—বিনবো? প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা সব যদি তুলে নিই—

—অত কমে হবে ?

—পাড়ারগাঁ। কে সেখান খন্দের হচ্ছে ? যদুর শুনলাম, চাষা গাঁ। গাঁয়েও অত টাকা দিয়ে কেনবার লোক নেই।

— টাকা দেবে কোথা থেকে ?

—প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা সব তুলে নিই। তোমার গহনা কিছু দাও আর ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কাছ থেকে কিছু ধার করি। আমার কাছেও সামান্য কিছু আছে।

শ্যামলীর মন নেচে উঠলো। কতদিন সে পাড়ারগাঁয়ের মুখ দেখেনি। বাপের বাড়ি ছিল হুগলী ছেলার তারকেশ্বর লইনে দাসপুর গ্রামে। সে বংশে বাতি দিতে কেউ নেই। জ্ঞাতি কাকারা পর্যন্ত উঠে এসে কলকাতা বাস করচেন, ঘোর ম্যালেরিয়া, চলে না সেখানে থাকা।

যদি এ সম্ভব হয় !

ভগবান কি এত দয়া করবেন ? তা কি তার কপালে সম্ভব হবে ?

শ্যামলী বললে—কিন্তু তুমি কোথায় থাকবে ?

- কেন, সেখানে।

—আপিস ?

—চাকুরী ছেড়ে দেবো। একঘেরে হয়ে গিয়েচে এ জীবন। আর ভালো লাগে না। স্বাস্থ্য যেতে বসেচে। একটু সাহস করে দেখি, যা আছে কপালে। ওখানে জায়গা জমি নিয়ে চাষবাস করবো।

—ছেলে দুটোর লেখাপড়া ?

—রাণাঘাটে বোর্ডিংয়ে থাকবে। সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখন। আর এ যা লেখাপড়া শিখচে, এ শিখে তো কেরাণী হবে ? তার চেয়ে ভালো কাজ

ওখানে শিখতে পারবে। বিলেত থেকে লোক গিয়ে আমেরিকায় বাস ক'রে আমেরিকা যুক্তরাজ্য স্থাপন করেছিল। অজানায় পাড়ি না দিলে মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে না। জীবন উপভোগই যদি না করলুম, বেঁচে থেকে কি হবে? গ্রামের লোকদের কাছে ছোটো ভালো কথা বলবো। নাইট স্কুল করবো। বই পড়তে শেখাবো। এ আমার অনেক দিনের ইচ্ছা।

স্বামী-স্ত্রীতে মিলে সারা বিকেল আর রাত ধরে পরামর্শ হোল। শ্যামলীর চোখে রঙীন স্বপ্ন ভেসে উঠেচে—দূরের পাখী-ডাকা ফুল-ফোটা সুমুখ জ্যোৎস্না রাত্রির প্রহরগুলি। কত অলস মধ্যাহ্নে বনানীকোলে ঘুঘুর ডাক শোনা। বহানায় আধ-জাগরিত আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে! কত আশ্রমুকুলের গন্ধে সুবাসিত সকাল-সন্ধ্যা।

দিনপনেরো পরে।

যত্নবাবুর সঙ্গে একটি প্রোট ভদ্রলোক শ্যামলীদের বাসায় ঢুকলেন। যত্নবাবু বল্লেন, উনি এখানে খাবেন।

শ্যামলীকে আঁড়ালে বল্লেন—উনি ওদের স্টেটের নায়েব, ওঁরও নাম যত্নবাবু। তবে উনি কায়স্থ। আমাকে বলে কয়ে উনিই বাড়ি দেওয়াচ্ছেন। অতি ভদ্রলোক। একটু ভাল করে খাওয়াও . দাওয়াও। সাড়ে তিনের মধ্যে হয়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে জমিদারের খাস কিছু রোয়া ধানের জমি আছে, সেটাও ওই সঙ্গে হয়ে যাবে।

আহারাদির পরে ভদ্রলোক অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করলেন যত্নবাবুর সঙ্গে। তারপর চা খেয়ে বিদায় নিলেন। এর তিনদিন পরে শ্যামলীকে যত্নবাবু বল্লেন, বাড়ি রেজেষ্ট্রি করা হয়ে গিয়েচে।

আষাঢ় মাসের শেষের দিকে জিনিসপত্র গুছিয়ে শ্যামলীরা তাদের নতুন কেনা বাড়িতে বাস করতে চললো। কলকাতার বাসা একেবারে উঠিয়ে দিলে ন', কিছু কিছু জিনিসপত্র ঘরে রেখে ঘর চাবিবদ্ধ করে গেল।

রাণাঘাট থেকে ট্রেন বদলে বনগাঁ লাইনের গাংনাপুর স্টেশনে ওরা বেলা দশটার সময় নামলো। আগে থেকে বন্দোবস্ত করার ফলে বল্লভপুর গ্রামের একখানা গরুর গাড়ি স্টেশনে উপস্থিত ছিল।

মাঠ ও বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এ গ্রাম ও গ্রাম পেরিয়ে চললো গাড়ি। বেলা প্রায় তিনটের সময় সামনের একটা ঝাঁকড়া বটগাছ দেখিয়ে গাড়োয়ান বলল—ওই বুঁদীপুরের বনবিবিতলা দেখা যাচ্ছে—ওর পরেই বল্লভপুর।

শ্রামলীর বুক ঢলে উঠলো। কি জানি কেমন হবে এত আশা-সুখে কেনা বাড়িটা, কেমন হবে সেখানকার জীবনযাত্রা! জানাকে ফেলে অজানাকে তো আঁকড়ানো হোল চোখ বুজে, এখন সেই অজানার প্রকৃতি কি, সেটা এখনি তো বোঝা যাবে আর একটু পরেই। কি গিয়ে দেখবে যে সেখানে, কি জানি? সর্বস্ব খুইয়ে তার বিনিময়ে কেনা। ক্রমে আরও আধঘণ্টা কেটে গেল। বেলা বেশ পড়ে এসেছে। এমন সময়ে গাড়োয়ান বলল—এই যে বাবু বাড়ির সামনে এসে গিয়েছে গাড়ি। নামুন মা-ঠাকরুন এবার।

ডুক ডুক বক্ষে শ্রামলী নামলো সকলের আগে। যতবাবু বললেন—না দেখে বাড়ি কেনা। এতগুলো টাকা—বলতে গেলে সর্বস্ব খুইয়ে—এই দূর গায়ে বাড়ি কেনা। তুমি আগে নেমে বাড়িতে ঢোকো। মেয়েরা ঘরের লক্ষ্মী কিনা, তুমি আগে ঢোকো। আমার তো সাহস হচ্ছে না, কি জানি কি রকম হবে! নামো আগে।

—ই্যাগো বাড়ি কি পরিষ্কার করা আছে, না একগলা ধুলো আর মাকড়সার জাল আর চামচিকের বাসা। গিয়ে এখন ঝাঁট দিতে হবে? চাবি কোথা?

গাড়োয়ান শুনতে পেয়ে বলল—মা ঠাকরুন, বাড়িতেই আছে মুক্তোর মা গয়লানী আর তার ছেলে। তারাই বাড়ি দেখাশুনো করে, নিচের একটা ঘরে আছে। চাবি তো নেই, বাড়ি খোলাই পড়ে আছে।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে একেবারে শ্রামলীর

সামনেই যে বাড়িটা পড়লো, সেটা দেখে ও আনন্দে ও বিস্ময়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এই বাড়ি তাদের। এমন বাড়ি এই অজ পাড়াগাঁয়ে!

কলকাতায় এমনি হলদে রং করা সবুজ রংয়ের জানালা খড়খড়িওয়ালা দোতলা বাড়ি দেখে—দোতলাও নয়, বাড়িটা তেতলা—কিন্তু এমন বাড়িটা সত্যিই তাদের নিজস্ব!

শ্রামলী আনন্দে চৈচিয়ে উঠে বলে—ওগো ছাখো, এসে ছাখো—

পরক্ষণেই ওর লজ্জা হোল। গাড়োয়ানটা না জানি কি আদেখলেই মনে করলে ওকে। ততক্ষণে যত্নবাবু ও ছেলেমেয়েরা বাঁশঝাড়ের মোড় ছাড়িয়ে বাড়ির কাছে এসে গিয়েচে। যত্নবাবু বলেন—বাঃ, বেশ—বেশ—

রাস্তায় আসতে গাড়োয়ানকে যত্নবাবু বাড়ির কথা বহুবার জিগ্যেস করেছিলেন। সে বলেছিল—চমৎকার বাড়ি বাবু। কলকাতার বাবুরা থাকবার জন্টি করলেন। তেতলা বাড়ি, দরাজ জায়গা, নদীর ধারে বাঁধাঘাট আছে, ফল পাকড়ের গাছ। ছাখবেন বাড়ির মত বাড়ি।

কিন্তু ছোটলোকের সে কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারেনি শ্রামলী বা তার স্বামী। এখন বাড়িটা দেখে মনে হোল গাড়োয়ান অনেক কমিয়ে বলেছিল। বাড়িটা সম্বন্ধে আসল কথা হচ্ছে, অনেকখানি ফাঁকা জায়গার মধ্যে বাড়িটা দাঁড়িয়ে, অথচ ঠিক পাশেই গ্রামের বসতি।

বনানীর ও মাঠের সবুজের মধ্যে হলদে রংয়ের বাহার।

ওরা হুড়মুড় করে সবাই গিয়ে বাড়ি ঢুকলো। নিচের ঘরে গিয়ে দেখলে সেখানে এক বুড়ি মাদুরের ওপর ঘুমিয়ে আছে। শ্রামলী ডাকলে—ও ঝি—কি ঘেন নাম ওর—মুক্তোর মা? ও মুক্তোর মা—

বুড়ি ধড়মড় করে জেগে উঠে বসলো। তারপর ঘুমজড়ানো চোখে ওদের দিকে খুব সামান্য একটুখানি চেয়ে থেকে তাড়াতাড়ি মাদুর ছেড়ে উঠে এসে শ্রামলীর পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করে বলে—পোড়াকপাল আমার মা, ঘুমিয়ে

পড়িচি এই অবেলায় । বেন্বেলা থেকে ওপরে নিচে সর ঘর খোলাম, পৌছলাম, ছাদ ঝাঁট দেলাম, বলি মা ঠাকরুনরা আসচেন, বাবু আসচেন—তা ছাদ তো নয় গড়ের মাঠ, এই হাতির মত বাড়ি ধোয়ানো সামলানো কি এক দিনের কস্মো ? আসুন, মা ঠাকরুন, আসুন বাবা—

শ্রামলী বলে—তোমার নাম মুক্তোর মা ?

—বলে সবাই । বলো না, অদেষ্টের মাথায় মারি সাত খ্যাংরা । নামটাই আছে বজার, যার জন্মি নাম দে আর নেই । তা হ'লি কি আজ আমার ভাবনা—

শ্রামলীর ওসব কথা ভালো লাগছিল না । তার ইচ্ছে হচ্ছিল এক দৌড়ে বাড়িটার ওপরে নিচে সব দেখে আসে । কিন্তু কী মনে করবে এরা । কী মনে করবে মুক্তোর মা ।

ওরা সবাই মিলে নিচের ঘরগুলো দেখলে । বড় বড় দুটো ঘর, প্রশস্ত থামওয়ানা ঝিলিমিলি বসানো বারান্দা, ওদিকে অণু একটা ছোট রোয়াকের সামনে রান্নাঘর । শ্রামলীর বড় ছেলে কানাই বলে—মা, এ তো রান্নাঘর নয়, এ আমাদের কলকাতার বাসার ঘরের চেয়েও অনেক বড় । ঝাখো কেমন আলমারি দেওয়ালের গায়ে ?

বড় মেয়ে ডলি বলে—কতগুলো জানলা ঝাখো মা রান্নাঘরে !

ওপরে সিঁড়ি বেয়ে ছুড়ুড় করে সবাই উঠলো । শ্রামলী বলে—ওগো, ঝাখো কি সুন্দর মেজে । কাঁচের সার্দি বসানো জানালা !

কানাই ও ছোট ছেলে বলাই একসঙ্গে চৌঁচিয়ে বাল্ল—কি সুন্দর সিনারি, দেখে যাও মা বারান্দা থেকে—ওই তো মাঠটার পরেই কেমন সুন্দর ছোট নদীটা, ওপারে সবুজ মাঠ, কেমন কোপ আর বাবলা গাছ, গরু চরচে—ও কি ফুল ফুটেচে ওপারের ক্ষেতে বাবা ?

যত্বাবু বলেন—ও ঝাঙের ফুল । বর্ষাকালে সন্দের সময় ঝাঙের ফুল ফোটে

কিনা! সত্যি, ভারি সুন্দর সিনারিই বটে, ওংগা, ঝাখো ইদিকে এসে!
কি ফাঁকা!

শ্রামলী বললে—তেতলার ঘরটা দেখে আসি চলো।

তেতলার ঘরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু খুব বড় বড় তিনটি জানলা তিনটি দেওয়ালে। রাঙা মাটির পালিশ করা মেজে। দরাজ ছাদ, ছাদের ওপর থেকে বহুদূরব্যাপী মুক্ত মাঠের সবুজ বাণী এই আষাঢ় সন্ধ্যায় ওদের অন্তর স্পর্শ করলে। শ্রামলীর গোখে জল এলো। এ যে রূপকথার রাজবাড়ি তার কাছে, সে গরীব ঘরের মেয়ে, গরীব ঘরের বৌ, কলকাতার বাসার অন্ধকূপে আজীবন কাটিয়ে আজ কি ভাগ্যে এমন বাড়িঘর নিজের মনে করবার অধিকার পেল। কানাই ইতিমধ্যে ছুটে এসে বললে—বাঁধাঘাট দেখে এলাম মা। একটু ভেঙে ভেঙে চটা উঠে গিয়েচে চাতালের। তবুও দিব্যি আরামে নাইতে পারবে। ওই তো—দেখা যাচ্ছে—এই উঠোনটা পার হয়েই—

যহুবাবু বললেন—নাঃ, সাড়ে তিন হাজার টাকা নিক। জিনিসের মত জিনিস। বাড়ির মত বাড়ি। ছেলেপুলে নিয়ে দরাজ জায়গায় বাস করো। এই তো পাশেই গাঁয়ের কি পাড়া। ডাক দিলেই লোক পাবে। কোনো ভয় নেই। আমি এখানেই একটা কিছু করবো। এত লোকের চলচে আর আমার চলবে না? খুব চলবে। তোমরা দাঁড়াও জিনিসপত্রের সব ওপরে নিয়ে আসি। কি কি গাছ আছে মুক্তোর মা?

মুক্তোর মা বললে—তিনটে আমগাছ আছে, সাতটা কাঁটাল গাছ, একটা পেয়ারা গাছ, একটা চালতে গাছ, একটা বিলিতি কুলগাছ, দুঝাড় কলাগাছ, চারটে নারকেল গাছ। বাবুরা নিজের হাতে সব লাগিয়েছিল থাকবে বলে। সখ করে কলকাতা থেকে চারা এনে এই ওবছরও ওই ঝাখো একটা টাঁপাকুলগাছ বসিয়ে গিয়েচে।

একটু পরে সন্ধ্যা হয়ে অন্ধকার নামলো। শ্রামলীর দুঃখ হোল, এখন আর

কিছু দেখা যাবে না। নতুনতর জীবনযাত্রার পথে নতুনতর দেশের প্রতি-
পথঘাট চিনে নেওয়া যেতো, ভাল করে দেখা যেতো আলোভরা দিনমানে।

শ্যামলী তাডাতাড়ি লঠন জ্বাললে। ডাকলে—মুক্তোর মা, ও মুক্তোর মা—
মুক্তোর মা মালপত্র গাড়ি থেকে নামিয়ে এনে দোতলার তুলছিল। বললে—
কি মা?

—জল আছে বাড়িতে?

—জল তুলে রেখেছি একটা বালতিতে, আর তো পাত্তব নেই মা তাই
তুলতে পারিনি—

—সে কথা বলচিনে, বাড়িতে জল আছে? কুরোটুয়ো—

—বাধানো পাত্তকুয়ো আছে। নাওয়ার ঘর আছে, রান্নাঘরের পেছনে।
চলুন, আমি দেখিয়ে দি। বাবুদের বাড়ি কোন ক্রটি ছিল না মা, আগাগোড়া
সান বাধানো। চৌবাচ্চা আছে বাধানো।

—তাতে জল তুলে রাখো নি?

—নাইবেন যদি তবে পাত্তকুয়োর জলে কেন মা? দিব্যি বাধানো নদীর
ঘাট, অসাগর জল নদীতে। এখন জোয়ার এসেচে, সব পৈঠাগুলো ডুব
গিয়েচে! চলুন গা ধুয়ে আসবেন।

শ্যামলী নদীর ঘাটেই নাইতে গেল। ঘাটের ঠিক পাশে কি একটা বড় প্রাচীন
গাছ। তার ছায়া পড়েছে বাঁধাঘাটের পৈঠাগুলোতে। কি একটা পুষ্পের
স্বাস বাতাসে ভুরভুর করচে। এই গাছ থেকেই আসচে।

—কি ফুলের গন্ধ মুক্তোর মা?

—কি একটা লতা এই গাছে উঠেচে মা, কাল সকালে দেখবেন সাদা সাদা
ফুল ফুটেচে। ভারি বাস বেরোয় রাত্তিরি।

শ্যামলী জলে নামলো। আজ সে রূপকথার রাজকণ্ঠে। স্নিগ্ধ জল,
ওপারের দিক থেকে হাওয়া বইচে। সেই ফুলের স্নগন্ধ। তারাভরা আকাশ।

এই বাঁধা ঘাট, এই প্রাচীন কি বনস্পতি, এই বনপুষ্প-স্বাস--সব তাদের, তাদের নিজস্ব। তারা পয়সা দিয়ে কিনেচে। কলকাতায় সেই পচা ড্রেন, কলতলা, অভয়া, বিশ্বাস গিন্নি সব স্বপ্ন হয়ে গিয়েচে একদিনে। তাদের জন্তেই সত্যি কষ্ট হোল। বেচারী মতির মা। বেচারী শশীবাবু বৌ। ওদের একবার এখানে আনতে হবে। না, এও স্বপ্ন, এখনো যেন বিশ্বাস হয় না এত সৌভাগ্য।

ডলি চাঁচিয়ে ডাকচে দোতলার বারান্দা থেকে—ওমা, শীগগির গা ধুয়ে এসো—বাবা চা চাইচে—এসো চট করে—

শ্রামলী স্বপ্নলোক থেকে নেমে এল। সানবানের বাক্সটা নেই। আনতে ভুলে গিয়েচে তাডাতাডিতে।

—মুক্তোর মা, ছুটে যাও বডদিদিকে বলগে যাও, ছোট তোরঙ্গের মধ্যে সানবানের বাক্সটা আছে, দিতে।

বিপদ

বাড়ি বসিয়া লিখিতেছিলাম। সকাল বেলাটায় কে আসিয়া ডাকিল—
জ্যাঠামশাই? একমনে লিখিতেছিলাম, একটু বিরক্ত হইয়া বলিলাম—কে?

বালিকাকণ্ঠে কে বলিল—এই আমি, হাজু।

—হাজু? কে হাজু?

বাহিরে আসিলাম। একটি যোল সতেরো বছরের মলিন বস্ত্র পরনে
মেয়ে একটি ছোট ছেলে কোলে দাঁড়াইয়া আছে। চিনিলাম না। গ্রামে
অনেকদিন পরে, নতুন আসিয়াছি, কত লোককে চিনি না। বলিলাম—কে তুমি?

মেয়েটি লাজুক স্বরে বলিল—আমার বাবার নাম রামচরণ বোষ্টম।
এইবার চিনিলাম। রামচরণের সঙ্গে ছেলেবেলায় কড়ি খেলিতাম। সে
আজ বছর পাঁচ ছয় হইল ইহলোকের মায়া কাটাইয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান
করিয়াছে সে সংবাদও রাখি। কিন্তু তাহার সাংসারিক কোনো খবর রাখিতাম
না। তাহার যে এতবড় মেয়ে আছে, তাহা এখনই জানিলাম।

বলিলাম—ও! তুমি রামচরণের মেয়ে? বিয়ে হয়েছে দেখি। স্বশুর-
বাড়ি কোথায়?

—কালোপুর।

—বেশ বেশ। এটি খোকা বুঝি? বয়েস কত হলো?

—এই দু'বছর।

—বেশ। বেঁচে থাক। যাও বাড়ির মধ্যে যাও।

—আপনার কাছে এইচি জ্যাঠামশাই। আপনি নোক রাখবেন?

—লোক? না, লোক তো আছে গয়লা বোঁ। আর লোকের দরকার নেই
তো। কেন? থাকবে কে?

—আমিই থাকতাম। আপনার মাইনে লাগবে না, আমাদের ছুটো খেতে দেবেন।

—কেন তোমার শশুরবাড়ি ?

মেয়েটি কোনো জবাব দিল না। অত শত হাঙ্গামাতে আমার দরকার কি ? লেখার দেবী হইয়া যাইতেছে। সোজাসুজি বলিলাম—না, লোকের এখন দরকার নেই আমার।

তারপর মেয়েটি বাড়ির মধ্যে ঢুকিল এবং পরে শুনলাম সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। চাল লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

মেয়েটির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, হঠাৎ একদিন দেখি, রায়েদের বাহিরের ঘরের পৈঠায় বসিয়া সেই মেয়েটি হাউমাউ করিয়া এক টুকরা তরমুজ খাইতেছে। যে ভাবে সে তরমুজের টুকরাটি ধরিয়া কামড় মারিতেছে, ‘হাউমাউ’ কথাটি স্পষ্ট ভাবে সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ঐ কথাটাই আমার মনে আসিল। অতি মলিন বস্ত্র পরিধানে। ছেলেটি গুর সঙ্গে নাই। পাশে পৈঠার উপরে দু-এক টুকরা পেঁপে ও একখণ্ড তালের গুড়ের পাটালি। অনুমানে বুঝিলাম আজ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে রায়-বাড়ি কলসী-উৎসর্গ ছিল, এসব ফলমূল ভিক্ষা করিতে গিয়া প্রাপ্ত। কারণ মেয়েটির পায়ের কাছে একটা পোটলা এবং সম্ভবত তাহাতে ভিক্ষায় পাওয়া চাল।

সেদিন আমি কাহাকে যেন মেয়েটির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনলাম মেয়েটি শশুরবাড়ি যায় না, কারণ সেখানকার অবস্থা খুবই খারাপ, দু’বেলা ভাত জোটে না। চালাইতে না পারিয়া মেয়েটির স্বামী উহাকে বাপের বাড়ি ফেলিয়া রাখিয়াছে, লইয়া যাইবার নামও করে না। এদিকে বাপের বাড়ির অবস্থাও অতি খারাপ। রামচরণ বোষ্টমের বিধবা স্ত্রী লোকের বাড়ি ঝি-বৃত্তি করিয়া ছুটি আপোগণ্ড ছেলেমেয়েকে অতি কষ্টে লালন-পালন করে। মেয়েটি মায়ের

ঘাড়ে পড়িয়া আছে আজ একবছর। মা কোথা হইতে চালাইবে, কাজেই মেয়েটিকে নিজের পথ নিজেই দেখিতে হয়।

একদিন আমাদের বাড়ির ঝি গয়লা-বৌকে কথায় কথায় জিগ্যেস করাতে সে বলিল—হাজু নাকি আপনার বাড়ি থাকবে বলেছিল ?

—হ্যাঁ। বলেছিল একদিন বটে।

—খবরদার বাবু, ওকে বাড়িতে জায়গা দেবেন না, ও চোর।

—চোর ? কি রকম চোর ?

—যা সামনে পাবে, তাই চুরি করবে। মুখুজ্যেবাডি রাখেনি ওকে, যা তা চুরি করে খায়, দুধ চুরি করে খায়, চাল চুরি কবে নিয়ে যায়—আর বড্ড খাই খাই—কেবল খাবো আর খাবো। ওর হাতীর খোরাক জোগাতে না পেরে দুখুজ্যেরা ছাড়িয়ে দিয়েচে। এখন পথে পথে বেড়ায়।

—ওব মা ওকে দেখে না ?

—সে নিজে পায় না পেট চালাতি। ওকে বলেচে, আমি কনে পাবো ? তুই নিজেরটা নিজে করে খা। তাই ও দোরে দোবে ঘোরে।

সেই হইতে মেয়েটির উপর আমার দয়া হইল। যখনই বাড়ি আসিত, চাল বা ডাল, দু-চারটে পয়সা দিতাম। বার দুই দুপুরে ভাত খাইয়াও গিয়াছে আমার বাড়ি হইতে।

মাসখানেক পরে একদিন আমার বাড়ির সামনে হাউ হাউ কান্না শুনিয়া বাহিরে গেলাম। দেখি, হাজু কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের বাড়ির দিকেই আসিতেছে। ব্যাপার কি ? শুনলাম মধু চক্রবর্তী নাকি তাহার আর কিছু রাখে নাই, তাহার হাতে একটা ঘটি ছিল, সেটিও কাড়িয়া রাখিয়া দিয়াছে—তাহাদের বাড়িতে ভিক্ষা কবিত্তে গিয়াছিল, এই অপরাধে।

রাগ হইল। আমি গ্রামের একজন মাতঙ্গব, এবং পল্লীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী ; তখনই মধু চক্রবর্তীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। মধু একখানা রাঙা

গামছা কাঁধে হস্তদস্ত হইয়া আমার বাড়ি হাজির হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—
মধু, তুমি একে মেরেচ ?

—হাঁ। দাদা, এক ঘা মেরেচি ঠিকই। রাগ সামলাতে পারিনি, ও আস্ত
চোর একটি। গুনুন আগে, আমাদের বাড়ি ভিক্ষে করতে গিয়েচে, গিয়ে
উঠোনের লক্ষা গাছ থেকে কৌচড় ভরে কাঁচা পাকা ঝাল চুরি করেচে প্রায়
পোয়াটাক। আর একদিন অমনি ভিক্ষে করতে এসে, দেখি বাইরের উঠোনের
গাছ থেকে একটা পাকা পেঁপে ভাঙে, সেদিন কিছু বলিনি—আজ আর রাগ
সামলাতে পারিনি দাদা। মেরেচি এক চড়, আপনার কাছে মিথো
বলবো না।

—না, খুব অশ্রায় করেচ। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা ওসব কি ?
ইতরের মত কাণ্ড। ছিঃ—যাও, ওর কি নিয়ে রেখেচ ফেরৎ দাও গে যাও।

হাজুকেও বলিয়া দিলাম, সে যেন আর কোনোদিন মধু চক্রবর্তীর বাড়ি ভিক্ষে
করিতে না যায়।

এই সময় আকাল স্কর হইয়া গেল। ধান-চাল বাজারে মেলে না, ভিথিরীকে
মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া বন্ধ। এই সময় একদিন হাজুকে দেখিলাম ছেলে কোলে
গোয়ালপাড়ার রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে দেখিয়া নির্বোধের
মত চাহিয়া বলিল—এই যে জ্যাঠামশায়। যেন মস্ত একটা স্মসংবাদ দিতে
অনেকক্ষণ হইতেই আমাকে খুঁজিতেছে।

আমি একটু বিরক্তির সহিত বলিলাম—কি ?

—এই ! আপনাদের বাড়িও যাবো।

—বেশ। আমাদের বাড়িতে প্রসাদ পাবি আজ—বুঝলি ?

হাজু খুব খুশি। খাইতে পাইলে মেয়েটা খুব খুশি হয় জানি। কাঁটালতলার
ছায়ায় রোয়াকে সে যখন খাইতে বসিল, তখন দুজনের ভাত তাহার একার
পাতে। নিছক খাওয়ার মধ্যে যে কি আনন্দ থাকিতে পারে তাহা জানিতে

হইলে হাজুর সেদিনকার খাওয়া দেখিতে হয়। স্ত্রীকে বলিয়া দিলাম—একটু মাছটাছ বেশি করে দিয়ে ওকে খাওয়াও...।

একদিন বোষ্টমপাড়ার হরিদাস বৈরাগীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের পাড়ার হাজু শুরবাড়ি যায় না কেন ?

—ওকে নেয় না ওর স্বামী।

—কারণ ?

—সে নানান কথা। ও নাকি মস্ত পেটুক, চুরি করে হাঁড়ি থেকে খায়। দুধের সর বসবার জো নেই কড়ায়, সব চুরি করে খাবে। তাই তাড়িয়ে দিয়েচে।

—এই শুধু দোষ ? আর কিছু না ?

—এই তো শুনিচি, আর তো কিছু শুনিনি। তারাও ভাল গেরস্ত না। তাহোলে কি আর ঘরের বোঁকে কেউ তাড়িয়ে দেয় খাওয়ার জন্তে ? তারাও তেমনি।

কিছুদিন আর হাজুকে রাস্তাঘাটে দেখা যায় নি। একদিন তাদের পাড়ার বোষ্টমবৌ বলিল—শুনেচেন কাণ্ড ?

—কি ?

—সেই হাজু আমাদের পাড়ার, সে যে বনগাঁয়ে গিয়ে নাম লিখিয়েচে।

আমি দুঃখিত হইলাম। এদেশে নাম লেখানো বলে বেপারবৃত্তি অবলম্বন করাকে। হাজু অবশেষে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করিল। খুব আশ্চর্যের বিষয় নয় এমন কিছু, তবু দুঃখ হয় গ্রামের মেয়ে বলিয়া। এখানেই এ ব্যাপারের শেষ হইয়া যাইত হয়তো, কারণ গ্রামে সব সময়ে থাকি-ও না, থাকিলেও সকলের খবর সব সময় কানেও আসে না।

পঞ্চাশের মন্বন্তর চলিয়া গেল। পথের পাশে এখানে ওখানে আজও দু-একটা কঙ্কাল দেখা যায়। ত্রিপুরা জেলা হইতে আগত বুড়ু নিঃস্ব হতভাগ্যেরা

পৃথিবীর বুকে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এ জেলায় মনুষ্যের মূর্তি অত তীব্র ছিল না। যে দেশে ছিল, সে দেশ হইতে নিঃস্ব নরনারী এখানে আসিয়াছিল, আর ফিরিয়া যায় নাই।

পৌষ মাসের দিন। খুব শীত পড়িয়াছে। মহকুমার শহরে একটা পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গিয়াছি, ফিরিবার পথে একটা গলির মধ্যে দিয়া বাজারে আসিয়া উঠিব ভাবিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া কয়েক পদ মাত্র অগ্রসব হইয়াছি, এমন সময়ে কে ডাকিল—ও জ্যাঠামশায়!

বলিলাম—কে?

—এই যে আমি—

আধ অন্ধকার গলিপথে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম। একটা চালাঘরের সামনে পথের ধারে একটি মেয়ে রঙীন কাপড় পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাপড়ের রঙ অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, আমি শুধু তাহার মুখের আবছায়া আদল ও হাত দুটি দেখিতে পাইলাম।

কাছে গিয়া বলিলাম—কে?

—বারে, চিনতে পারলেন না? আমি হাজু।

হাজু বলিলেও আমার মনে পড়িল না কিছু। বলিলাম—কে হাজু?

সে হাসিয়া বলিল—আপনাদের গাঁয়ের। বারে, ভুলে গেলেন? আমার বাবার নাম রামচরণ বৈরাগী। আমি যে এই শহরে নটী হয়ে আছি।

এমন সুরে সে শেষের কথাটি বলিল, যেন সে জীবনের পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে এবং সে জন্ম সে গর্ব অনুভব করে। অর্থাৎ এত বড় শহরে নটী হইবার সৌভাগ্য কি কম কথা, না যার তার ভাগ্যে তা ঘটে? গ্রামের লোক, দেখিয়া বুঝুন তার কৃতিত্বের বহরখানা।

আমি কিছু বলিবার পূর্বেই সে বলিল—আহুন না, দয়া করে আমার ঘরে।

—না, এখন যেতে পারবো না। সময় নেই।

—কেন, কি করবেন ?

—বাড়ি যাবো ।

সে আবদারের স্বরে বলিল—না । আসতেই হবে । পায়ের ধুলো দিতেই হবে আমার ঘরে । আহ্নন—

কি ভাবিযা তাহার সঙ্গে ঢুকিয়া পড়িলাম তাহার ঘরে । নিচু রোয়াক খড ছাওয়া, রোয়াক পার হইয়া মাঝারিধরণের একটি ঘর, ঘরে একখানা নিচু তক্তপোষের ওপব সাজানো গোছানো ফর্সা চাদর পাতা বিছানা । দেওয়ালে বিলিতি সিগারেটের বিজ্ঞাপনের ছবি দু-তিনখানা । মেমসাহেব অমুক সিগারেট টানিতেছে । একখানা ছোট জলচৌকির ওপর খানকতক পিতল-কাঁসার বাসন রেড়ির তেলের প্রদীপের অল্প আলোয় ঝক্-ঝক্ করিতেছে । মেজেতে একটা পুর্বনো মাদুর পাতা । বোষ্টমের মেয়ে, একখানা কেঁপঠাকুরের ছবিও দেওয়ালে টাঙানো দেখিলাম । ঘরের এক কোণে ডুগিতবলা এক জোড়া, একটা হুকো, টিকে-তামাকের মালমা, আরও কি কি ।

হাজু গর্বের স্বরে বলিল—এই দেখুন আমার ঘর—

—বাঃ, বেশ ঘর তো । কত ভাড়া দিতে হয় ?

—সাড়ে সাত টাকা ।

—বেশ ।

হাজু একঘটি জল লইয়া আসিয়া বলিল—পা ধুয়ে নিন—

—কেন ? পা ধোয়ার এখন কোনো দরকার দেখচিনে । আমি এখনি চলে যাবো ।

—একটু জল খেয়ে যেতে হবে কিন্তু এখানে জ্যাঠামশায় ।

এখানে জলযোগ করিবার প্রবৃত্তি হয় কখনো ? পতিতার ঘরদোর । গা ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিল । বলিলাম—না, এখন কিছু খাবো না । সময় নেই—

হাজু সে কথা গায়ে না মাথিয়া বলিল—তা হবে না। সে আমি শুনচি
নে কিছুতেই শুনবো না—বসুন—

তাহার পর সে উঠিয়া জলচৌকি হইতে একটা চায়ের পেয়ালা তুলিয়া
আনিয়া সম্বন্ধে সেটা আঁচল দিয়া মুছিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিল—দেখুন, কি নিচি
—আপনাকে চা করে খাওয়াবো এতে—চা করতে শিখিচি।

ড্রেসডেন চায়না নয়, অল্প কিছু নয়, সামান্য একটা পেয়ালা। হাজুর মনস্তৃষ্টির
জগৎ বলিলাম—বেশ জিনিস, বাঃ—

ও উৎসাহ পাইয়া আমাকে ঘরের এ জিনিস ও জিনিস দেখাইতে আরম্ভ
করিল। একখানা আয়না, একটা টুকনি ঘটি, একটা সুদৃশ্য কোঁটা ইত্যাদি।
এটা কেমন? ওটা কেমন? সে এসব কিনিয়াছে। তাহার খুশি ও আনন্দ দেখিয়া
অতি তুচ্ছ জিনিসেরও প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। এতক্ষণ ভাবিতেছিলাম,
ইহাকে এ পথে আসিবার জগৎ তিরস্কার করি এবং কিছু সহুপদেশ দিয়া জ্যাঠা-
মশায়ের কর্তব্য সমাপ্ত করি। কিন্তু হাজুর খুশি দেখিয়া ওগব মুখে আসিল না।

যে কখনো ভোগ করে নাই, তাহাকে ত্যাগ করো যে বলে, সে পরমহিতৈষী
সাধু হইতে পারে; কিন্তু সে জ্ঞানী নয়। কাল ও ছিল ভিখারিণী, আজ এ পথে
আসিয়া ওর অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে, কাল যে পরের বাড়ি চাহিতে গিয়া
প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের ঘবে বসিয়া গ্রামের লোককে চা
খাওয়াইতেছে, নিজের পরসায় কেনা পেয়ালা পিরিচে—বার বাবাও কোনোদিন
শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরম
সাফল্য ওর চোখে। তাহাকে তুচ্ছ করিয়া, ছোট করিয়া নিন্দা করিবার ভাষা
আমার জোগাইল না।

সঙ্কল্প ঠিক রাখা গেল না। হাজু চা করিয়া আনিল। আর একখানা কাঁসা
মাজা রেকাবিতে স্থানীয় ভাল সন্দেশ ও পেঁপে কাটা। কত আগ্রহের সহিত সে
আমার সামনে জলখাবারের রেকাবি রাখিল।

সত্যিই আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করিতেছিল।

এমন জায়গায় বসিয়া কখনো খাই নাই। এমন বাড়িতে।

কিন্তু হাজুর আগ্রহভরা সরল মুখের দিকে চাহিয়া পাশ্বে কিছু অবশিষ্ট রাখিলাম না। হাজু খুব খুশি হইয়াছে—তাহার মুখের ভাবে বুঝিলাম।

বলিল—কেমন চা করিচি জ্যাঠামশায়?

চা মোটেই ভালো হয় নাই—পাড়াগেঁয়ে চা, না গন্ধ, না আশ্বাদ। বলিলাম—
কোথাকার চা?

—এই বাজারের।

—তুই নিজে চা খাস?

—হঁ ছুটি বেলা চা না খেলে সকালে কোনো কাজ করতে পারিনে,
জ্যাঠামশায়।

আমার হাসি পাইল। সেই হাজু!.....

ছবিটি যেন চোখের সামনে আবার ফুটিয়া উঠিল। রায়বাড়ির বাহিরের ঘরের পৈঠার কাছে বসিয়া খোলাস্বন্ধ তরমুজের টুকরা হাউমাউ করিয়া চিবাইতেছে। সেই হাজু চা না খাইলে নাকি কোনো কাজে হাত দিতে পারে না।

বলিলাম—তা হোলে এখন উঠি হাজু। সন্দে উৎরে গেল। আবার অনেকখানি রাস্তা যাবো।

হাজুর দেখিলাম, এত শীঘ্র আমাকে ঘাইতে দিতে অনিচ্ছা। গ্রামের এ কেমন আছে, সে কেমন আছে, জিজ্ঞাসাবাদ করিল। বলিল—একটা কথা জ্যাঠামশায়, মাকে পাঁচটা টাকা দেবো, আপনি নিয়ে যাবেন? লুকিয়ে দিতে হবে কিন্তু টাকাটা। পাড়ার লোকে না জানতে পারে। মার বড় কষ্ট। আমি মাসে মাসে যা পারি মাকে দিই। গত মাসে একখানা কাপড় পাঠিয়ে দিলাম।

—কার হাতে দিয়ে দিলি?

—বিনোদ গোয়াল এসেছিল, তার হাত দিয়ে লুকিয়ে পাঠালাম ।

—তোমার ছেলেটা কোথায় ?

—মার কাছেই আছে । ভাবচি, এখানে নিয়ে আসবো । সেখানে খেতে-পরতে পাচ্ছে না । এখানে খাওয়ার ভাবনা নেই জ্যাঠামশায়, দোকানের খাবার খেয়ে খেয়ে তো অছেদ্রা হোল । সিঙ্গেড়া বলুন, কচুরি বলুন, নিমকি বলুন—তা খুব । এমন আলুর দম করে ওই বটতলার খোঁটা দোকানদার, এমন আলুর দম কখনো খাই নি । এই এত বড় বড় এক একটা আলু—আর কত রকমের মশলা—আপনি আর একটু বসবেন ? আমি গিয়ে আলুব দম আনাবো ? খেয়ে দেখবেন ।

নাঃ, ইহার সবলতা দেখিয়াও হাসি পায় । রাগ হয় না ইহার উপর । বলিলাম—না, আমি এখন যাচ্ছি । আর ওই টাকাটা আমি নিয়ে যাবো না, তুমি মনিঅর্ডার করে পাঠালেও তো পারো । অণ্ড লোকে দেবে কি না দেবে—বিনোদ যে তোমার মাকে টাকা দিয়েছে কিনা, তার ঠিক কি ?

হাজুর এ সন্দেহ মনে উঠে নাই এতদিন । বলিল—যা বলেচেন জ্যাঠামশাই, টাকাটা জিনিসটা তো এর ওর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিই । মা পায় কি না পায় তা কি জানি ।

—এ পর্যন্ত কত টাকা দিয়েচ ?

—তা কুড়ি পঁচিশ টাকার বেশি । আমি কি হিসেব জানি জ্যাঠামশাই ? মা কষ্ট পায়, আমার তা কি ভালো লাগে ?

—কার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিস ?

হাজু সলজ্জ মুখে চুপ করিয়া রহিল । বুঝিলাম আমাদের গ্রামের লোকজন ইহার নিকট যাতায়াত করে ।

বলিলাম—আচ্ছা, দে সেই পাঁচটা টাকা । চলি —

—আবার আসবেন জ্যাঠামশায়। বিদেশে থাকি, মাঝে মাঝে দেখে শুনে
যাবেন এসে।

গ্রামে ফিরিয়া হাজুর মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া টাকা পাঁচটি তাহার হাতে
দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কেউ তোমাকে কোনো টাকা দিয়েছিল ?

হাজুর মা আশ্চর্য হইয়া বলিল—কই না। কে দেবে টাকা ?

বিনোদ ঘোষের নাম করিতে পারিতাম। কিন্তু করিলে কথাটা জানাজানি
হইয়া পড়িবে। বিনোদ ভাবিবে আমারও ওখানে যাতায়াত আছে এবং হাজুর
প্রণয়ীদের দলে আমিও ভিড়িয়া গিয়াছি এই বয়সে। কি গরজ আমার ?

✓ জন্মদিন

আজ সকালের দিনটাই যেন কি রকম ।

যা-কিছু করবার ছিল, শেষ হয়ে গিয়েচে রায় বাহাদুরের, প্রথম যৌবনে যখন রাতুলপুর লালমোহন একাডেমির তিনি হেড-মাষ্টার—মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা মাত্র, তখন সেই রাতুলপুরের স্থলে পায়া-ভাঙা চেয়ারে বসে সম্মুখস্থ নিবিড় বাঁশ-বনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে কত কি দেখতে পেতেন সিনেমার ছবির মত । দেখতেন, এ দুঃখ থাকবে না, জীবন আসচে সামনে ; সে জীবনে কলকাতায় তাঁর ভিলা হবে বালিগঞ্জ, মোটর থাকবে, কলিং-বেল টিপলে উর্দিপরা খানসামা ঘরে ঢুকবে । তখন ছিল স্বপ্ন, স্বপ্ন ছিল অপূর্ণ রঙে রঙীন ।

আজ তাঁর বয়েস একষড়ি । আজ একষড়িতে পা দিলেন । লোক প্লেসেব বাড়ীর, নতুন বাড়ীর তেতালায় যে ছোট ঘরটি তাঁর শোবার ঘর, সে ঘরে আজ ভোরে জেগে উঠেই দেওয়ালের ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ পড়তেই রায় বাহাদুর দেখলেন আজ সাতাশে আষাঢ়, তেরশো বাহান্ন সাল । একষড়ি বছরে পড়লেন তিনি আজ ।

সকালটা কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন নয় । দিব্যি রোদ উঠেচে বাড়ার ছাদের মাথায়, সোঁদালি গাছগুলোর মগ-ডালে । মন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলো চা-পানের পর বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন । ছোট মেয়ে সুমিতা বলেছিল—বাবা, টোস্ট ভাজা হচ্ছে, দুখানা খেয়ে যাও চায়ের সঙ্গে—

—নাঃ । ও কি মাখন ? . আজ-কাল মাখন বলে যা বিক্রি হয় ও-দিয়ে টোস্ট আমাদের ধাতে নয় না । তোরা খা—

বলে রায় বাহাদুর বেরিয়ে পড়েছেন ।

খানিকটা এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরে রায় বাহাদুর লেকের ধারের বেঞ্চিতে এসে

বসলেন। একখানা মিলিটারি বোট কিছু দূরে ভাসাতে চেপ্টা করচে। একখানা লরি নিকটের রাস্তায় স্টার্ট দেওয়ার প্রচেষ্টায় প্রচুর গ্যাস ও শব্দ ছাড়চে। নাঃ, কোথাও যদি একটু শাস্তি আছে।

একঘটি হোল তা হোলে। যখন তিনি ষোল সতের বছরের ছেলে, তখন মনে আছে কারো বয়েস বত্রিশ কি চৌত্রিশ বছর শুনলে তাকে প্রৌঢ় বলে মনে হোত। চল্লিশ বছরের লোক তো ছিল বৃদ্ধের মধ্যে গণ্য। আর এরই মধ্যে তাঁর একঘটি বছর বয়েস হয়ে গেল? নিজেকে খুব বেশি বুড়ো বলে মনে করতে পারছেন না রায় বাহাদুর। সে-দিনও তো ধর্মতলার চুলকাটার সেলুনে বসে চুল ছাঁটিয়েছেন—কত দিন আর হবে? রায় বাহাদুর মনে মনে একটা মোটামুটি হিসেব করবার চেপ্টা করলেন। কাশী থেকে এসেছেন সে-বার। বেশ মনে আছে। লেসলির বাড়ীতে তাঁর শালাকে সে-বার চাকুরী জুটিয়ে দিলেন গণেশ সরকারের সাহায্যে। গণেশ সরকার তাঁর সহপাঠী, দু'জনে একসঙ্গে সে-কালের সিটি কলেজে পড়েছিলেন, গণেশ সরকার লেসলির বাড়ী বড় চাকুরী করতো—এখন অবসর নিয়েচে। গণেশেরও বয়েস তো হোল ষাট-একঘটি। দু'এক বছর কম বা দু'এক বছর বেশ। ওতে কিছু যায় আসে না।

সেটা হবে ১৯২০ সাল, দেখতে দেখতে পঁচিশ বছর হয়ে গেল—নিতান্ত কমই বা কি? ভাবলে মনে হয়—সেদিনকার কথা। হিসেব করলে দেখা যায়, হাওড়ার পুলের তলা দিয়ে অনেক জন চলে গিয়েচে তার পর।

তবে ওই যা ভাবছিলেন রায় বাহাদুর। বয়েস হোলে কি হবে, আর পঁচিশ জন বুড়োর মত তিনি নন। এমন কি পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছরের লোককে তিনি অনেক সময় বুড়ো বলে উল্লেখ করে থাকেন। নাতি ও ছেলেমেয়ের কাছে বলেন—সেই বুড়ো নাপিতটা আজ এসেছিল রে? নিজের চেয়ে দু'এক বছর কম বয়সের লোককে বলেন—আরে একেবারে বুড়ো মেরে গেলে যে! ছ্যা ছ্যা—দাঁতগুলো সব খুইয়েচ দেখচি।

তাঁর দাঁত এখনো অটুট আছে। দাঁতেই নাকি যৌবন, তিনি মনে মনে ভাবেন এবং পাঁচ জনকে বলেও বেড়ান। নিজের কাছে এই সত্যটা প্রমাণ করবার জন্তে তিনি মাঝে মাঝে পার্কে নির্জনে বসে চানাচুর ডাল-বাদাম-ভাজা কিনেও খেয়ে থাকেন।

—এই, কি দিচ্ছিচ্ছিস্ ও? ছুঁটো ডাল-ভাজা বেশি করে দিস্। টাকার ভাঙানি নেই? ব্যাটারী সব ডাকাত। চার পয়সার ডাল বাদাম নিলাম, বলে কি না টাকার ভাঙানি নেই! এই নে—যা—

বেশ জায়গা করেছে এই লোক। এই বেক্খিখানা বড় ভালো লাগে। মাঝে মাঝে এখানে এসে বসেন। নির্জনে বসে থাকতে ও ভাবতে বেশ লাগে। বাড়ীতে বড় গোলমাল, বসে ভাববার সময় নেই। ভাববার কথা অনেক কিন্তু বাইরের ঘরে ছেলে ও নাতিদের পড়ার মাস্টার এসে গিয়েচে এতক্ষণ—সুমিতার ঘরে সুমিতার বন্ধু অলোকা ও ডাক্তার বাবুর নাতনি বেলা এসে গিয়েচে। অত গুজ্-গুজ্ ফুস্ ফুস্ কেন? সুমিতার মাথা বিগড়ে দেবে ওই ডাক্তার বাবুর ধিক্কা নাতনীটা। কমিউনিস্ট! সেদিন কোথা থেকে একটি গাদা ওই সব কমিউনিস্ট বই-পত্ৰর সুমিতার বিছানায়। আজকাল কি যে হচ্ছে দেশে! মেয়েছেলেদের মধ্যেও কি না ওই সব!

এই তো গেল বাইরের ঘরের কথা। যদি বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসবেন, তবে অমনি প্রতিবেশী বৃদ্ধ ভুবন বাবু এসে জুটবে।

—এই যে রায় বাহাদুর। বসে আছেন নাকি? তামাক খাবেন না সকালবেলা? আজ কাগজ দেখেননি এখনো...ওকিনাওয়ার ব্যাপারটা দেখেচেন? ঘোল খাইয়ে ছাড়লে আমাদের বাবাজিদের। চা?...তা হয় হোক, আপত্তি নেই।

নয়তো অবিনাশ দালাল এসে বলবে—রায় বাহাদুর, কেমন আছেন? বেশ, ভালো ভালো। শুনে খুশি হোলাম। আর আমাদের এখন—ইয়ে, একটা

কথা। হরিশ মুখ্যে রোডের বাড়ীখানা একবার দেখবেন? আজই যেতে হয়। ওদের এটর্নিরা বড্ড প্রেস্ করচে। কাল আপনাকে ভাবলাম একবার ফোন করি। ক'টার সময় সুবিধে হবে? ওর চেয়ে ভালো আর পাবেন না— তবে বায়নার আগে রেজিষ্ট্রী আফিসগুলো একবার সার্চ করতে হবে। সে আমি করিয়ে দেবো, আপনাকে কিছু করতে হবে না। চা? এত বেলায়—আচ্ছা, তা—চিনি কম দিয়ে, হ্যাঁ—

কিংবা আসবে গলির জীবন মুখ্যে, ওর ভাইপোর একটা চাকরীর জন্তে অনুরোধ করতে। তিনি যত বলেন আজকাল তাঁর হাতে কিছু করবার নেই, চাকরী কোথা থেকে করে দেবেন—ততই তাঁকে আরও চেপে ধরে। বাড়ীর ভেতরে যে থাকবেন, সেখানেও বিপদ কম নয়। গৃহিণীর নানা রকম তাগাদা— ভাগনে-জামাইয়ের বাড়ী তত্ব না পাঠালে নয়, ওপরের ঘরের পাখাখানা মেরামত করে দাও—নানা ফৈজৎ।

তার চেয়ে এই বেশ আছেন।

পাশের বেঞ্চিতে একজন বৃদ্ধ লোক নাক টিপে বসে জপ কিংবা প্রাণায়াম করচে। ওদিকের বেঞ্চিতে একটি যুবক বসে লেকের জলের দিকে চেয়ে রয়েছে। এত সকালে আর কোনো দিকে কোনো লোক নেই।

হ্যাঁ, যা ভাবছিলেন। জীবনটা যেন কি রকম হয়ে গেল। রাতুলপুরের সেই দিনগুলি এই সকালবেলার রোদের মত স্বপ্নমাখা ছিল। এখন সে স্বপ্নের আবেশও স্মৃতি থেকে টেনে আনতে পারেন না। সেই রাতুলপুরের স্কুলের চটা-ওঠা দেওয়ালটা। নবীন নাপিত চাকর ঘণ্টা বাজাতো। তাঁর জন্তে টিফিনের সময় বাজার থেকে নিমকি রসগোল্লা এনে দিত। নবীনের ছেলেটি মারা গেল টাইফয়েডে, ফ্রি পড়তো স্কুলের নিচের ক্লাসে। তার জন্তে একদিন স্কুল বন্ধ হোল। হেডমাস্টার ছিলেন গুরুচরণ সাহাল। অনেক দিনের প্রবীণ শিক্ষক। তাঁকে বলতেন, আপনি হচ্ছেন ইয়াংম্যান, কেশববাবু, এ সব স্কুলে আপনার

পোষাবে না। এ সব কাজ কাদের জানেন, যাদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। যেমন ধরুন আমাদের। এ ব্যেয়ে কোথায় যাচ্ছি বলুন!

বেরিয়েছিলেন রাতুলপুর স্কুল থেকে তার পরের বছরেই। ভবিষ্যতের সন্ধানে। ভবিষ্যৎ তাঁকে একেবারে প্রতারণা করেনি। অনেকের চেয়ে তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, সব দিয়েও ভবিষ্যৎ তাঁকে যেন কিছুই দেয়নি। তাঁর স্বপ্নকে কেড়ে নিয়েছে, আশাকে কেড়ে নিয়েছে। ফুরিয়ে গিয়েছেন তিনি, নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়েছেন। যে ভবিষ্যৎ আজ অতীত, তাতে তিনি জেতেননি—ঠকেছেন।

আজ তাঁর বয়স—থাক বয়সের কথা। ওটা সব সময় মনে না করাই ভালো। বয়সের কথা মনে না আনবার জন্মেই তিনি পার্কে বসে ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর বাড়ীর কাছে একটা পার্ক আছে, ছোট পার্কটাতে লোক-পাড়ার পেনসনপ্রাপ্ত জজ, সবজজ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বড কেরণী প্রভৃতি বৃদ্ধের দল নিয়মিত ভাবে বেড়াতে আসে। এ-বেঞ্চিতে ও-বেঞ্চিতে বসবে আর সামাজিক ও শারীরিক কথাবার্তা বলবে। অন্যের নাত্নির বিয়ের কি হোল, অন্নের নাত্নি এবার ম্যাট্রিকে বৃত্তি পেয়েছে। মেয়ে ছেড়ে ওরা নাত্নিতে নেমেছে। নাত্নি সম্বন্ধে এমন উচ্ছ্বসিত হবে যেন কারো নাত্নি কোনো দিন ম্যাট্রিক পাশ করেনি। সব নাত্নিই অসাধারণ, সাধারণ নাত্নি একটাও চোখে পড়েনি। নাত্নির প্রসঙ্গের পরে উঠবে বাতের প্রসঙ্গ, দাঁতের ব্যথার প্রসঙ্গ, রক্তের চাপের প্রসঙ্গ। যমদূত যেন দণ্ড উচিয়ে বসে আছে পার্কটার প্রত্যেক বেঞ্চিখানার ওপরে। সে আবহাওয়ায় বসলেই মনে হয়—

“এবার দিন ফুরুলো

সম্মুখে চলো

ইহকাল পরকাল হারিও না—”

কিংবা—“মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর”

কিংবা—“বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে বটে

যাচ্চ তুমি শ্মশানঘাটে”

ইত্যাদি। ..

দিন কতক গিয়ে তাই রায় বাহাদুর আর ওই সব ক্ষুদ্র সামাজিক পার্কে যান না, যেখানে বাত-ব্যাদিগ্রস্ত পেন্সনভোগী বৃদ্ধদের যাতায়াত। তার চেয়ে আসেন তিনি এই লেকের ধারে, শ্যাম-বনকুঞ্জ পাও রে। হরিবর্ণ দ্বীপটি জলের এক দিকে, কত সুগঠিত দেহ তরুণ কত প্রণয়চপলা তরুণী কলেজের ছাত্রী আসে-যায়। ওয়াকাইয়ের দল কলহাস্তে চটুলপদে বেড়ায় মাঝে মাঝে, ঠোটে রং, খাঁকির আঁটসাঁট পোষাক পরনে। না, এখানে লাগে ভাল। যৌবনের হাওয়া বয় সর্বদা!

তিনি এখনো বাঁচবেন অনেক দিন। হাত দোঁখিয়ে বেড়ান এখানে সেখানে রায় বাহাদুর, সোদিন কজ্জন পার্ক এক উড়িয়া জ্যোতিষী তাঁকে বলেচে। তা ছাড়া এ তিনি জানতেন। তাঁর আয়ু যে প্রায় নব্বুইয়ের কাণ ঘেঁসে যাবে, জ্যোতিষী না বললেও তা তিনি জানেন।

আজ এত পয়সা রোজগার করেও, কলকাতার এত বড় বাড়ী করেও, ভি এইট ফোর্ড চালিয়েও মনে হচ্ছে রাতুলপুরের সেই দিনগুলো চব্বিশ বছরের সতেজ যৌবন নিয়ে যদি আবার ফিরে আসতো...সেই বাঁশবনের দিকে চেয়ে স্বপ্ন দেখা...ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজাতো নবীন নাপিত ..কত নির্জনে বসে জীবনের ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকা....

তখন ছিলেন গরীব স্কুল-মাষ্টার, আজ তিনি বড়লোক। স্কুল মাষ্টারি ছেড়ে এক বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসা ধরলেন, ইনসিওরেন্সের কোম্পানী খুললেন নিজে, বড় আপিস হোল, ধুলোমুঠো ধরলে সোনামুঠো হোতে লাগলো। দেশহিতকর কাজও ছুঁ-চারটা যে না করেচেন এমন নয়, পয়সা যথেষ্ট হয়েছে। ছেলেরা বলে—ভালো

গাড়ী কিনুন বাবা । একখানা মাসে ডিঙ্ক্‌ বেন্‌জ্‌ দেখে এলাম কাল—খরগোষের মত নিঃশব্দে চলে—কি ফোর্ড গাড়ীতে চড়বেন চিরদিন ।

যুদ্ধের আগেকার কথা অবিশি । তেলের অভাব ছিল কি ?

কিছু ক্যালকাটা প্রপার্টিজও করলেন, যার জন্মে কলকাতার বড় লোকেরা হাঁ করে থাকে । বাড়ী বিক্রি থাকলেই রায় বাহাদুর কিনবেন । এটর্নির আপিসে গিয়ে হয়তো জানা গেল বাড়ী থার্ড মর্টগেজ । প্রথম দুই বন্ধকী খতের টাকা শোধ দিয়েও বাড়ী কিনেচেন, জেদের বণবর্তী হয়ে । দিনকতক জমি কেনাবেচা আরম্ভ করলেন । এই লোক অঞ্চলে, বালিগঞ্জ ষ্টোর রোডে, গড়িয়াহাটা অঞ্চলের অনেক বাড়ী তাঁর জমির ওপরে । এসব কাজে ঠকেচেনও অনেক, দায়শূন্য ভেবে যে সম্পত্তিতে হাত দিয়েচেন, রেজিষ্ট্রী আপিস অনুসন্ধান করে দেখা গেল তার অবস্থা কাহিল । মানুষকে বিশ্বাস করা যে কত বিপজ্জনক !

আজ সব করেও তিনি ফুরিয়ে গিয়েচেন । বড় ছেলে আপিস বেরোয় । ভালো কাজ বোঝে, তাঁর অভাব কেউ অনুভব করে না আপিসে, ঘরেও না । মেয়ে-ছেলেরা এখন মালিক হয়েচে, নিজেরাই ব্যবস্থা করে, তাঁকে জিজ্ঞেসও করে না অনেক সময় । কেবল গিন্নী এখনো পুরোনো দিনের সুর বজায় রেখেচেন, তাঁকে না হুকুম করলে গিন্নীর চলে না । মুখ নাড়া মুখ-ঝাড়া সব তাঁরই ওপরে । আসলে পুত্রবধূদের প্রতাপে তিনিও প্রায় অর্ধ বাতিল । সুন্দরী বড় পুত্রবধূটির দাপট সবচেয়ে বেশি, কলেজে-পড়া মেয়ে, মুখের কাছে কেউ এগোতে পারে না, মুখের সৌন্দর্য্যে ত্রিভুবন জয় করতে পারে । বাড়ীর ঝি-চাকর তার কথায় মরে-বাঁচে । বুড়া-বুড়ীকে বড় কেউ একটা গ্রাহের মধ্যে আনে না ।

তাই তো বলচেন, তিনি ফুরিয়ে গিয়েচেন । একষটি বছরেই ফুরিয়ে গেলেন ।

আজ গাড়ীর পঞ্চম চক্রের মতই তিনি অনাবশ্যক । ওই রাতুলপুরে তিনি প্রথম প্রেমে পড়েন । পুরুত-গিরি করতেন বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী, তাঁর মেয়ে, নাম

নিরুপমা। সহরের তুলনায়—তঁার বড় পুত্রবধু প্রতিমার তুলনায় হয়তো নিরুপমা তত কিছু ছিল না তবুও সে সুন্দরী ছিল, মুখশ্রী কিন্তু চমৎকার। বাড়ীতে আর কেউ থাকতো না পুরুত ঠাকুরের, নিরুপমার সঙ্গে বুড়া জলপাই গাছের তলায় ছপুরের ছায়ায় লুকিয়ে দেখা হোত মাঝে মাঝে। ষোল বছরের স্ত্রী কিশোরী।

এক দিন নিরুপমা ছুটি পাকা আতা ছ'হাতে নিয়ে এসেছিল। হেসে বললে

—তুমি আতা খাও ?

—কেন খাবো না ?

—এই নেও। আমাদের গাছের আতা।

—শুধু আতা দিলে আতা নেবো না—

নিরুপমা চোখ বড় বড় করে বললে—তবে কি ?

—আর কিছু দিতে হবে ঐ সঙ্গে—

—কি ?

—এই দেখিয়ে দিচ্ছি কি—সরে এসো—

—খ্যৎ—ভারি ছুঁ তো !...

হাত ছাড়িয়ে নিরুপমা ছুটে পালিয়ে গেল হরিণীর মত চটুল গতিতে।

আর এক দিন।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী সেদিন তাঁর মায়ের তিথি উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজনে গ্রাম্য মাষ্টারটিকেও নিমন্ত্রণ করেছেন। খেতে বসেছেন ভাবী রায় বাহাদুর। পরিবেষণ করছে নিরুপমা, আরও পাঁচ-ছ' জন ব্রাহ্মণ একত্র খেতে বসেছে। হঠাৎ খেতে খেতে মুখ তুলে দেখলেন নিরুপমা ঘরের মধ্যে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। উনি ঈষৎ হেসে ফেলতেই নিরুপমাও মুহূ হেসে জানালা থেকে সরে গেল।

কালকার কথা বলেই মনে হচ্ছে।

অথচ কত কাল হয়ে গেল—চল্লিশ বছর !

আজও চোখ বুজলে নিরুপমার সে সলজ্জ দুষ্টমিব হাসি তিনি দেখতে পান। এক-আধ দিন নয়, এ রকম কত ঘটনা ঘটেছিল এক বছর ধরে। নিরুপমার সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাবও হয়েছিল। বিবাহ হয়েও যেতো কিন্তু গ্রামের বিধুভূষণ মজুমদার এক সামাজিক জোট পাকালেন। রায় বাহাদুর কিশোরকুণি থাকের ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ কৃষ্ণনগরের রাজারা যে বংশের তখনকার আমলে কিশোরকুণি থাকের পাত্রকে কুলীনেরা কণ্ঠাদান করতেন না। সেকালে এমনিই ছিল। বিবাহ ভেঙে গেল। রায় বাহাদুর বিদেশী লোক, কেউ তাঁকে খবর দেওয়ার ছিল না। বিবাহের দিন নিরুপমা কেঁদেছিল, না, কাঁদেনি ?

শুধু এই সংবাদটা পাবার জন্তে রায় বাহাদুর কত চেষ্টা করেচেন, কেউ এ সংবাদ তাঁকে দিতে পারেনি। আর কখনো নিরুপমার সঙ্গে তাঁর দেখাও হয়নি।

কেই বা তাঁকে সংবাদ এনে দেবে ?

এই ঘটনার কিছু দিন পরে রায় বাহাদুর সে গ্রাম ত্যাগ কবে আসেন। আর যাননি কোনো দিন। জীবনের প্রথম প্রেম, সে সব দিনের বথা ভাবলেও হারানো যৌবন আবার ফিরে আসে যেন।

গুথান থেকে চলে আসবার পব তিনি কত বার ভেবেচেন, নিরু আজ কোথায় আছে ? কেমন আছে ? তাঁর জন্ত নিরু কি ভেবেছিল ?

এ সংবাদ তাঁকে আর কেউ দেয়নি। বিবাহ কবেছিলেন বড লোকের সুন্দরী মেয়েকে। কিন্তু নিরুকে ভোলেন নি কোনো দিন। প্রথম প্রথম খুবই ভাবতেন. মধ্যে দশ-বিশ বছর আর ভেমন ভাবতেন না, অর্থ উপার্জনের নেশায় ভুলে ছিলেন। এখন আবার মাঝে মাঝে মনে হয়।

একটি তরুণ যুবক এসে কিছু দূবে একটা নারকোল গাছের তলায় দাঁড়ালো। এ-দিকে ও-দিকে চেয়ে যেন সে কাউকে খুঁজচে। রায় বাহাদুর সচকিত হয়ে উঠলেন। ছোকরা নিশ্চয়ই ওর প্রেমিকার সন্ধানে এসেচে। তাঁর ছোট ছেলে

অমিয়জীবনের বয়সী। আজকাল অমনি হয়েছে যে। তাঁদের সময়ে কিছুই ছিল না। তরুণী অভিসারিকাদের পক্ষে স্বর্ণযুগ চলেচে এটা। কই, ছোকরা একা বসে আছে উদ্ভ্রান্ত ভাবে, তিনি কই? মানে, যা লক্ষ্মীটি? এখনো আসেন না কেন?

আজ রায় বাহাদুরের ইচ্ছে হোল রাতুলপুর যাবেন। একবার গিয়ে দেখে আসবেন। তাঁর মনে হচ্ছে, চল্লিশ বছর যেন কেটে যায়নি, যেন তিনি নব্য যুবকই আছেন, ভ্রমরকৃষ্ণ গুচ্ছ আছে তাঁর, যেন তিনি ব্লাডপ্রেসারে ভুগেন না আজ দু' বছর, যেন তাঁর বাত হয়নি সেবার আশ্বিন মাসে এবং বাতে কিছু দিন শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন না—যেন রাতুলপুরের আম শিমুল জাম কাঁটালের ঘন ছায়ানিকুঞ্জে চিরযৌবনা নিরুপমা আশ্রিত কিশোরী, তাঁরই আশায় পথ চেয়ে বসে আছে।

গাছতলার সেই যুবকটি কিছু দূরে একটা বেঞ্চির ওপর হতাশ ভাবে বসে পড়েচে। বেচারী!

সেই রাত্রেই রায় বাহাদুর মনে মনে ঠিক করে ফেললেন। তিনি রাতুলপুরে যাবেনই। কাল সকালে উঠেই যাবেন। ছোট মেয়ে সুমিতা এসে বলে—বাবা, রাত্রে কি খাবে? বৌদিদি বলে পাঠালেন—

রায় বাহাদুর মুখ খিঁচিয়ে বলেন—কেন তিনি কি জানেন না আমি রাতে কি খাই? যাও পর্দাটা তুলে দাও—

সুমিতা মুখের অপূর্ব ভঙ্গি করে চলে গেল। রায়বাহাদুরের দোতলার দক্ষিণমুখী বসবার ঘর। সামনের দেওয়ালে সবই জানালা। সুমিতা জানালার পর্দা খুলে দিয়ে চলে গেল। পুরু 'গদি' আঁটা মিষ্টি কোঁচে বসে শেড দেওয়া লম্বা ডালের আলোতে রায় বাহাদুর অন্তমনস্ক ভাবে একখানা বাংলা মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিলেন। এসব পত্রিকা-টত্রিকা এনেচে মেয়ে বা বৌমাঝি। তিনি এসব পড়েন না।

বড় পুত্রবধু প্রতিমা রূপের হিল্লোল তুলে ঘরে ঢুকে বললে—আমায় ডেকেচেন ?
—হ্যাঁ। আমি কি খাবো জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েচ কেন ? আমি কি খাই ?
প্রতিমা জানে শব্দর বৃদ্ধ হয়ে ইদানীং খিটখিটে হয়ে পড়েচেন। সে সান্ত্বনার
সুরে বললে—না, সে জ্ঞে না। আপনি দুদিন কিছু খাচ্ছেন না রাত্রে, বলেন সাবু
করে দাও। তা আজও কি সাবু খাবেন, না লুচি খানকতক গরম গরম করে
আনবো। ভালো মাগুর মাছ আছে কি না, তাই বলে পাঠালুম—

—মাগুর মাছের কথা কেউ আমাকে তো বলেনি। সবাই হয়েছে—

—তা হলে ছ'খানা লুচিই আনি গে ভেজে।

—হ্যাঁ, রাত তিনটে কোরো—

—দশ মিনিটের মধ্যে আনচি বাবা।

না, এ সংসারে সুখ নেই। তাঁর মুখের দিকে কেউ তাকায় না।

গিন্নি কি এতই ব্যস্ত যে একবার এসে তাঁর খাওয়ার খোঁজ নিতে পারেন
না। আজ যদি —

প্রতিমা একটু পরেই রূপার থালায় লুচি সাজিয়ে ও একটা খুরো বসানো
ছোট রূপার বাটিতে মাছের বোল নিয়ে ঘরে ঢুকলো। রায় বাহাদুর বললেন—
তোমার শাশুড়ী কি করচেন ?

প্রতিমা স্থললিত ভঙ্গিতে আঁচল সামলে নিয়ে বললে—মা ঠাকুরঘর থেকে
বেরোননি ত ?

—বেশ, বেরুতে হবে না।

—বসুন, জল নিয়ে আসি বাবা, টেবিলেই খাবেন তো ?

রায় বাহাদুর বিরক্তির সঙ্গে বললেন—রেডিওটা সর্বদা ঝং ঝং করলে আমার
মাথা ধরে যায়। কে খুলেচে রেডিও ? ছোট বোমা বুঝি ? বন্ধ করে দাও—
ও নাকি সুরে গান সর্বদা বরদাস্ত করতে পারিনে—

রাতুলপুরেই যাবেন তিনি। অসহ্য হয়ে উঠেচে এ সংসার। শাস্তি বলে

জিনিস নেই এখানে। একবার গির ঘুরে আসবেন প্রথম ধোবনের শত মধুস্বতি-মাথা গ্রামটিতে। হয়তো নিরুপমার সঙ্গে দেখা হয়েও যেতে পারে—অস্তুত সেই সব জায়গাতেও আবার গেলে জীবনের একঘেয়েমিটা কেটে যাবে।

মাথা ধরেচে বেজায়। শুধু ওই রেডিওটা ব জে। কতবার তিনি বারণ ব রেচেন—কিন্তু এ বাড়ীতে তাঁর কথা কেউ আমলে আনে? সাধে কি তিনি—শরীর কেমন কিম কিম করচে।

মধ্য-রাত্রে বড় পুত্রবধু প্রতিমার ছোট খোকাটি জেগে মায়ের ঘুম ভাঙালো। প্রতিমা উৎকর্ণ হয়ে শুনলো দোতলায় শশুরের ঘর থেকে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক গোঁঙানির শব্দ আসচে। সে তখন নিচে এসে সকলের ঘুম ভাঙালো। রায় বাহাদুর বিছানায় গুটিগুটি হয়ে অস্বাভাবিক ভাবে শুয়ে আছেন, তাঁর মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ বার হচ্ছে। বড় ছেলে বাড়ী নেই। ছোট ছেলে ফোন করে দিলে ডাক্তারকে। তারপর নিজেও ছুটলো। খুব-হৈ-চৈ উঠলো। সবাই ঝুঁকে পড়লো বিছানার ওপরে, বড় মেয়েকে আনতে মোটর ছুটলো বাগবাজারে। ঝি, চাকর, মেয়ের দল, পুত্রবধুর দল, নাতি-নাতনীরা মিলে লোকে লোকারণ্য ঘরের ভেতর। রায় বাহাদুর কি একটা বলচেন অস্পষ্ট গোঁঙানির মধ্যে—কেউ বুঝতে পারচে না। প্রতিমা কান পেতে ভাল করে শুনে বলে—নিরু কে? নিরু কার নাম? নিরু নিরু করে যেন কি বলচেন।

ডাক্তার এসে বলে স্ট্রোক হয়েছে। সেবাশুশ্রূষা চললো, বড় ছেলেকে টেলিগ্রাম করা হোল রংপুরে। সেখানে সে যুদ্ধের বড় কনট্রীকটারির কাজে গিয়েচে। ট্রাঙ্ক-কল্ করা গেল মেজ ছেলেকে বারিয়ার কয়লার খনিত্তে।

সেদিন বেলা বারোটোর আগে রায় বাহাদুর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

✓ কাঠ-বিক্রী বুড়ো

আমি গাছ বিক্রী পছন্দ করি না। কোনো গাছ যদি কেউ কাটে তবে আমার বড় কষ্ট হয়। লোককে পরামর্শ দিই গাছপালা দেশের সম্পদ, ধরণীর শ্রী ওরা বাড়িয়েচে ফুলে, ফলে, ছায়ায় সৌন্দর্যে—ওদেরই ডালে ডালে দিন রাত কত বিহগ-কাকলী, ওদের কেটে নষ্ট কোরো না।

সুতরাং যখন গ্রামের ঘাটে কাঠের নৌকো এসে লাগলো, আমি সেটা পছন্দ করিনি।

একদিন সকালে বসে লিখচি, একজন দাড়িওয়ালা বুড়ো মুসলমান এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে আমায় সেলাম করলে হাত তুলে। বল্লাম—কি চাই?

—বাবুর গাছ বিক্রী আছে, বিক্রী করবেন?

—কি গাছ?

—বাবুর বাড়ির পেছনে বিলিতি চটকা আছে, বাগান শিশু আছে, কলুচটকা আছে।

লোকটার কথায় দক্ষিণের টান। বল্লাম—বাড়ি দক্ষিণে?

—হ্যাঁ বাবু, বসিরহাটের ওপার। টাকি শ্রীপুর।

—গাছ কিনতে এসেচ নাকি?

—বাবু, আমাদের নৌকো এসেচে ঘাটে। কাঠ বোঝাই হয়ে কলকাতায় যাবে। আপনাদের এদিকে যদি বাগান টাগান পাওয়া যায় কিনবো।

বাগান কেনা শুনে আমি আগেই চটেছি, সুতরাং লোকটার সঙ্গে ভালো করে কথা বল্লাম না।

ও বল্লে—বাবু, গাছ বেচবেন?

—না।

—ভালো দর দেবো বাবু।

—কি রকম দর শুনি ?

—তা বাবু আপনার বড় চটকা গাছটা ত্রিশ টাকা দর দেবো।

আমি আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। এ অঞ্চলে ও গাছের দাম যুদ্ধের আগে একজন বলেছিল ছ'টাকা। যুদ্ধের মধ্যে ওর দাম উঠলো চোদ্দ টাকা। ওটাকেই সর্বোচ্চ দাম বলে আমি ভেবেছিলাম। একটা বুনো চটকা গাছের দাম চোদ্দ টাকা—ওই যথেষ্ট। আশাতিরিক্ত দর। আর এখন এ বলে কি !

চল্লিশ টাকা একটা চটকা গাছের দাম এ কথা পাঁচ বছর আগেও কেউ কানে শোনে নি। আমার বাগান-সংলগ্ন জমিতে এরকম চটকা গাছ পাঁচ ছ'টা আছে, বেশ মোটা পয়সা পেতে পারি দেখি গাছ ক'টা বিক্রী করলে।

হঠাৎ মনে পড়লো নেপল্‌স উপসাগরের তীরে কোন এক বড় গাছতলায় গ্লিনি বসে বই লিখতেন, নীল জলরাশি তাঁর চোখের সামনে দূর স্বপ্ন-জগতের বাণী ভাসিয়ে আনতো, দৃশ্যমান জগতের ওপারে যে বৃহত্তর স্বপ্ন-জগৎ দিক থেকে দিগন্তরে বিস্তৃত। আমি একটা রঙীন ছবিতে নেপল্‌স উপসাগর তীরের এই ধরনের গাছের ছবি দেখেছিলাম। চটকা গাছগুলো দেখতে ঠিক তেমনি। মনে মনে আমি ওদের নাম দিয়েছিলাম গ্লিনির গাছ। টাকার জন্তে সে গাছগুলো কেটে উড়িয়ে দেবো ?

লোকটাকে বললাম—না হে, ও গাছ বিক্রী হবে না।

সেই থেকেই কাঠের নৌকা নিয়ে লোকটা আমাদের গ্রামের ঘাটে রয়ে গেল। দু' তিনটি বড় বড় বাগান কিনে তার সমস্ত আম গাছ কাটিয়ে ওঁড়িগুলো নৌকা বোঝাই করতে লাগলো—ডালপালা সস্তাদরে গ্রামের লোকজন জ্বালানির জন্তে কিনে নিলে ওর কাছ থেকে। রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপটা অনেকদিন থেকে পোড়ো, ভূতের বাসা হয়ে আছে—কারণ একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি ছাড়া রায়-বাড়িতে

বর্তমানে আর কেউ থাকে না। লোকটা রায়-কাকাকে বলে সেই চণ্ডীমণ্ডপের একপাশে আছে, আরও দু'টি সঙ্গী নিয়ে—চণ্ডীমণ্ডপের উত্তর দেওয়ালের গায়ে বাইরের দিকে একখানা খেজুর-পাতার চালা উঠিয়ে নিয়ে সেখানেই রান্না করে খায়। একটা বাঁশের তিক্‌ডিতে হাঁড়িকুড়ি রাখে।

গাছগুলো কেটে ফেলচে গ্রামের ছায়াসম্পদ ও শ্রীকে নষ্ট করে—এজন্তে কাঠ-বিক্রী বুড়োকে আমি পছন্দ করতাম না। ওর সঙ্গে বেশি কথাও বলতাম না।

নদীর ধারে ওদের নৌকো থাকে, যেখানে নদীর পাড় খুব ঢালু, বড় বড় উলু ঘাসের বন, ভাঁট বন, পটুপটি গাছ—সেখানে ওদেরই কাটা এক কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে থাকি বিকেলে, বেশ ফাঁকা জায়গা, অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ দেখা যায়। নীল আকাশের নিঃশব্দ বাণীর মত নেমে আসে অপরাহ্নের শান্তি।

কাঠ-বিক্রী বুড়ো আমার কাছে আসে নৌকো থেকে নেমে।

আমি বলি—আর কতদিন আছে? গাছগুলো তো দেশের সাবড়ালে।

আমি কি বলছি ও বুঝতে পারে না। গাছগুলো সাবাড় করলে ক্ষতি যে কি তা ওর বোঝবার বুদ্ধি নেই। ও বলে—না বাবু, কি আর এমন লাভই বা হবে, বড় খরচ পড়ে যাচ্ছে।

—কিসের খরচ?

—এই জন খরচ, কাটাই খরচ।

—কলকাতায় কি দর বিক্রী হে?

—আজ্ঞে সাড়ে তিন টাকা কিউবিক ফুট। মিথ্যে কথা বলবো না আপনার কাছে।

লোকটা আর কিছু ইংরেজী জানুক আর না জানুক কিউবিক ফুটের মাপটা জানে। কারণ ওই করেই খায়। তাছাড়া ওকে দেখে আমার

মনে হয় লোকটা সরল, সাদাসিদে। কুটিল, ধূর্ত ব্যবসাদার নয়। ও আমায় তামাক সেজে এক একদিন খাওয়ায়। স্মৃথুঃখের ছুঁটো কথা বলে।

ক্রমে যত দেখি বুড়া বড় বড় বাগান কেটে উড়িয়ে দিচ্ছে, ততই ওর ওপর আমার বিতৃষ্ণা জমে। পয়সার জন্তে এরা সব পারে।

রাস্তাঘাটে দেখা হোলে ভালো করে কথা বলিনে।

বুড়া কিন্তু যেচে কথা বলতে আসে আমার সঙ্গে। প্রায় তিন চার মাসের বেশি আমাদের গ্রামে আছে, গ্রামের সকলের নাম-ধাম ভালো করেই জেনে ফেলেচে। কে কোথায় কাজ করে, কত মাইনে পায়, কার কি রকম অবস্থা এ সব ওর জানা হয়ে গিয়েচে। মাঝে মাঝে আমার বাড়ি এসে সন্ধ্যার সময় বসে। তামাক খায়, প্রতিবেশীর মত গল্প করে। একদিন আমায় বলে—বাবু বুঝি বই লেখেন।

—হ্যাঁ।

—বই ছাপান কোথায়?

—কলকাতায়।

—কত খরচ পড়ে?

—পাঁচ ছ'শো, হাজার।

—তা বাবু আপনার মত আমাদের যদি হোত। চির জীবনটা কষ্ট করেই কাটলো। একটা ছেলে আছে, জমিদারি কাছারিতে কাজ করে টাকির বাবুদের। আট টাকা মাইনে পায়। বাবুরা ওকে বড় ভালবাসে। আবহুল না হ'লে কোন কাজ হবে না লায়ের বাবুর। সাইকলের পিছনে তুলে নিয়ে সাতক্ষীরে যায় মোকদ্দমার দিন থাকলে। আর বছর পূজোর সময় বাড়ি এলো, তা ডিম এনলো চার কুড়ি। আর গাওয়া ঘি—

বুড়া দিব্যি গল্প জমিয়ে বসে। তামাক খায়। কিছুক্ষণ পরে আবার চলে যায়।

মাঝে মাঝে ওকে জিজ্ঞাসা করি—কেমন লাভ হবে এবার ?

—কি জানি বাবু ?

—অনেক গাছ তো কাটলে ।

—ওতে কি হয় বাবু—এখনো অনেক গাছ কাটুতি হবে ।

—মোটটা টাকা লাভ করবে এবার ।

—দোয়া করুন বাবু, তাই যেন হয় । কনটোলের কাপড় একখানা দিতি পারেন বাবু, নইলে ঞাংটা হতি হবে ।

অনেকদিন ধরে ওর সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি । বুড়োও নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে, আমিও থাকি নিজের কাজে ব্যস্ত । এমন কি ওর কাছে কিছু ডালপালা কিনলাম জালানির জন্তে, তার দাম নিতেও এল না ।

এই সময় আমাদের গ্রামে আমাদের এক তরুণ প্রতিবেশী টাইফয়েড জ্বরে পড়লো । তার চাষবাস আছে, বাজারে ছোট একখানা ফলের দোকান আছে, স্ত্রী ও পাঁচটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে ।

রোগ দিন দিন বেড়ে ক্রমে বাঁকা পথ ধরলো । আমরা পাড়ার সবাই রাত জেগে দেখাশুনো করি, ছ'তিনটি ছোকরা আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী দূরের শহর থেকে কখনো ঔষধ, কখনো ডাক্তার, কখনো ফল, কখনো বরফ আনতে দিনে-রাতে চার পাঁচবার ছুটোছুটি করে । তরুণী স্ত্রী ও ছেলেমেয়েগুলির মুখের দিকে চেয়ে গ্রামের লোকেরা কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে গ্রহণ করে না ।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না ।

চব্বিশ দিন জ্বরভোগের পর রোগী মারা গেল । গ্রামেব মেয়েরা চার পাঁচদিন ধরে ব্যস্ত রইল সত্গোবিধবা মেয়েটিকে সাহায্য দিতে । পুরুষেরা ব্যবস্থা করতে লাগলেন ওদের বিষয়-আশয় কি হবে, চাষবাসের কি বন্দোবস্ত করা যায় ।

কান্নাকাটির গোলমালে দিন দশ বারো কেটে গেলে একদিন সন্ধ্যাবেলায়

একটা দৃশ্য দেখলুম, যা আমার কাছে এত ভালো লাগলো যে শুধু যেন সেই ঘটনাটার কথা বলতেই এ গল্পের অবতারণা।

বেলা আর নেই, ছিপগুলি নিয়ে পুকুর থেকে ফিরিচি মাছ ধরে, ওদেরই বাড়ির পাশ দিয়ে। দেখি যে সেই কাঠ-বিক্রী বুড়ো মুসলমান ওদের উঠোনে বসে তরুণী বিধবাকে সাহুনা দিচ্ছে। রাস্তার ধারেই ওদের রান্নাঘরের ছেঁচতলা, প্রতিবেশীর স্ত্রীটি বসে কি কাজ করছে রান্নাঘরের দাওয়ায় আর বুড়ো বসে আছে ছেঁচতলায়। শুনলাম ও বলছে—সব দিকই দেখুন মা ঠাকরোন, বেঁচে চেরকাল কেউ থাকে না। তিনি অল্প বয়সে গিয়েছেন এই হোল আসল কষ্ট। তা আপনার বাচ্চাকাচ্চাদের মুখির দিকে চেয়ে আপনি কোমর বাঁধুন। নইলি আজ আপনি অস্থির হ'লি ওরা কোথায় দাঁড়াবে মা ঠাকরোন? চোকির জল আর ফ্যালবেন না -আপনার চোকি জল দেখলি বুক ফেটে যায়—

আমি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে গিয়েচি। দেখি যে বুড়ো মুসলমান ময়লা গামছার খুঁটে নিজের চোখের জল মুছে ফেলছে।

এর চেয়ে কোনো অপূর্বতর দৃশ্যের বন্দনা আমি করতে পারিনি।

সেই সন্ধ্যায় একটি অতি মধুর গীতি-কাব্যের মত মনে হোল এর উদার আবেদন।

—

✓ হারুণ-অল-রসিদের বিপদ

জানিপুর থেকে ছুটি ছেলে পডতে আসে ইস্কুলে ।

এ অঞ্চলে আর ইস্কুল নেই, ওদের বাড়ীর অবস্থা ভালো, যদিও সাতপুরুষের মধ্যে অক্ষরপরিচয় নেই, তবুও বাপমায়ের ইচ্ছে, যখন ধান বেচে কিছু টাকা পাওয়া গেল, তখন ছেলেরা লেখাপড়া শিখুক । চাষা লোকদের জন্তেও লেখাপড়ার দরকার আছে বই কি । ধানের হিসেব, জন মজুরের হিসেব রাখাও তো চলবে ।

ওরা আসে মাদলার বিলের ধাবের বড় মাঠের ওপর দিয়ে । আজকাল সকালে ইস্কুল, সোদালিফুলের ঝাড় দোলে মাঠের মধ্যে, কত কি পাখী ডাকে, বড় বড় খোলাওয়াল গাঁড়িগুলো বিলের দিকে নামে মাঠের পথ বেয়ে, আশ ধানের জাঙলা খায় লুকিয়ে ছাড়া গকতে । ওবা পরামাণিকদেব বাগানের আম কুড়তে কুড়তে চলে আসে মাঠ ও বাগানের মধ্যে দিয়ে, যদি সামনে বিপিন মাষ্টারের বেতের ভয় না থাকতো ইতিহাসের ঘটায়, তবে বড় মজাই হোত । কিন্তু তা হবার নয়, এমন সুন্দর পথযাত্রার শেষে অপেক্ষা করচে রুক্ষমূর্তি বিপিন মাষ্টার ও তার হাতের খেজুর ডালের বেত ।

একটি ছেলের নাম হারুণ, আর অপরটির নাম আবুল কাসেম । ছুটি বেশ দেখতে, পাড়ারগায়ের ছেলে, শাস্ত চেহারা, অতি সরল, কলকাতা তো দূরের কথা, মহকুমার টাউন বনগাঁও কখনো দেখেনি । আবুলের হাতে অনেক গুলো পদ্মফুল, মাদলার বিল থেকে তুলেচে, ক্লাসের টেবিল সাজাবে, ফণি মাষ্টার ফুল ভালবাসেন, তাঁকে দিতে হবে ।

হারুণ বলে—এই আবুল, এঁচড় পাড়বি ?

—কোথাকার রে ?

—চল না, রাস্তার গাছে। ও গাছ তো সরকারি, তুমিও পাড়তে পারো, আমিও পারি।

—কি হবে এ চড়? বিপনে মাষ্টারকে দিবি?

—তাই চল, যাবার সময়ে ওর বাড়িতে ছু'খানা বড় দেখে দিয়ে যাই। মাসের দায় বেঁচে যাওয়া যাবে এখন।

বেত্রভীতি-থেকে উদ্ধার পাওয়ার এ পথ ওদেরই আবিষ্কৃত। যেদিন ওরা এঁচড় দেয়, সেদিন ইতিহাসের ঘটায় ওদের দেখতে পান না যেন বিপিন মাষ্টার। অল্প সবাইকে মারেন। ওরা গাছে উঠে ছু'খানা বড় এঁচড় সংগ্রহ করলে। হারুণ উঠলো গাছে, আবুল রইল নিচে দাঁড়িয়ে। কোষ-ওয়ালো বড় এঁচড়। ইতিহাসের পড়া কারো হয়নি আজ।

রাস্তার ধারে বিপিন মাষ্টারের টিনের বাড়ীটা। বাইরে কেউ নেই।

হারুণ ডাকলে—শুর, শুর—

বিপিনের স্ত্রী ঘুমচোখে বাইরে আসতে আসতে বলাছিলেন—আপদগুলো সকালবেলাই এসে—

এমন সময় ওদের হাতের এঁচড় দেখে খেমে গিয়ে মুখে হাসি এনে, গলার সুর মোলায়েম করে বলেন—কিরে? এঁচড়? কোথেকে আনলি?

ওরা এঁচড় ফেলে চলে এলো। বিপিন মাষ্টার ইস্কুলে গিয়েছেন ওদের আগে। আজ তাঁরই প্রথম পিরিয়ডে ক্লাস। একটু দেরি করে ক্লাসে ঢুকলে আট আনা জরিমানা করা তো বাধাধরা রুটিনের কাজ।

ওরা ঢুকলো ক্লাসে ছুরু ছুরু বক্ষে।

বিপিন মাষ্টার কড়া সুরে হেঁকে বলেন—এই যে! হারুণ আর আবুল—এদিকে এসো—

ওদের একজন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। বিপিন মাষ্টার বলেন—দেরি কিসের?

—আজ্ঞে, এঁচড়—

—কি ? এঁচড় ? কিসের এঁচড় ? সরে এসো এদিকে—

পিঠে বেত পড়বার আর দেরি নেই দেখে হারুণ ভূমিকাভাঙ্কল্য না কৰে সংক্ষেপে আসল কথাটা বলবার প্রচেষ্টায় উত্তর দিলে—আপনার বাড়ীতে এঁচড়—

—কি ? আমার বাড়ীতে ? তার মানে ?

এঁচড় ছ'খানা বেশ বড় বড় । আপনার বাড়ীতে দিয়ে এলাম ।

—কবে ?

—এখন শ্রাব । তাইতে তো দেরি হোল—এঁচড় পাডতে দেরি হোল—

বিপিন মাষ্টারের উত্তর বেত্র নেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে । এ যে কতবড় অমোঘ মহৌষধ ওরা ছ'জনেই তা জানে । বিপিন মাষ্টার আর কোনো কথা বল্লেন না, ওরা ছ'জনে গট্ গট্ কবে ক্লাসের মধ্যে ঢুকে সামনের বেঞ্চির ভালো ছেলে যুগলকে ঠেলে সরিয়ে সেখানে বসবার চেষ্টা করতে যুগল দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—দেখুন শ্রাব, আমি কতক্ষণ থেকে বসে আছি এখানে, আমাকে টেনে ওরা বসতে চাচ্ছে এত দেরিতে এসে—

বিপিন মাষ্টার মুখ খিঁচিয়ে বল্লেন—বসতে চাইচে তা হয়েছে কি ? তোমার একার জন্তে বেঞ্চি হয়নি—সরে বসে ওদের বসতে দাও । ওরা কি দাঁড়িয়ে থাকবে—ডেঁপো ছোকরা কোথাকার—

হারুণ এক ঠালা মেরে যুগলকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে বসে পড়লো । আবুল বসলো যুগলের ওখানে । যুগল বেচারীকে উঠেই যেতে হোল ছ'দিক থেকে ঠালা খেয়ে । বিপিন মাষ্টার দেখেও দেখলেন না । আজ তিন পিরিয়ড বিপিনবাবুর ।

ওরা বুঝে-সুজেই আজ এঁচড় এনেচে । তিন পিরিয়ডের ধাক্কা সামলাতে হবে তো ? কিন্তু তার চেয়েও বড় ধাক্কা আজ পৌঁছলো এসে । ওরা ছ'জনে

ক্লাসের বাইরে এসে দেখলে একখানা ঘোড়ার গাড়ি স্কুলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে।

হারুণ বললে—কে রে? কে এল?

আবুল ঠোঁট উন্টে বললে—কি জানি!

এমন সময় ওপর ক্লাসের শিবনাথ মাষ্টার বারান্দা দিয়ে আসতে আসতে বল্লেন—যাও সব ক্লাসে গিয়ে বোসো। ইন্সপেক্টর বাবু এসেছেন—এখুনি ক্লাস দেখতে আসবেন—

সব ছেলে চুপচাপ ক্লাসে এসে বসে। আবুল ও হারুণ সেই সঙ্গে এসে বসে ওদের গাঁয়ের পাশে রসুলপুর, সব মুসলমান চাষীদের বাস। সে গ্রাম থেকে পড়তে আসে একটি ওদের বয়সী ছেলে, নাম তার হায়দাব আলি। হারুণ বললে—আমাদের পরনে ময়লা কা পড়—

হায়দার বললে—তাতে কি হয়েছে?

—মার খাবি এখন—

—ইস্, তা আর জানিনে! মারলেই হোল।

কথাটা বললে বটে, কিন্তু মনে ততটা ভরসা ছিল না হায়দারের। ভয়ে ভয়ে সে ক্লাসে গিয়ে ঢুকলো। একটু পরে সাহেবি পোশাকপরা ইন্সপেক্টর এবং তাঁর পেছনে হেডমাষ্টার ওদের ক্লাসে দেখা দিলেন। বিপিনবাবু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

ইন্সপেক্টর বাবু বল্লেন—এটি কোন্ ক্লাস? বেশ বেশ। এদের কিসের ঘণ্টা?

বিপিন বাবু বল্লেন -- ইতিহাসের।

—বেশ বেশ।

পরে হারুণের দিকে চেয়ে বল্লেন—কি নাম?

হারুণ ভয়ে ভয়ে বললে—হারুণ-অল-রসিদ।

—অ্যা ?

—শ্যার, হারুণ-অল-রসিদ।

—বোগদাদ থেকে কবে এলে ?

—আজ্ঞে, শ্যার ?

—বলি বোগদাদ ছেড়ে এখানে ছদ্মবেশে নয়তো ?

হারুণ বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। হেডমাষ্টার হাসলেন।

—সরে এসো এদিকে। ইতিহাস পড়েচ ?

—আজ্ঞে, শ্যার।

—কুতুবুদ্দীন কে ছিলেন ?

হারুণ বলে—রাজা।

—কোথাকার রাজা ? কোথায় থাকতেন ?

—বিলেতে।

—বেশ। আকবর কে ছিলেন ?

হারুণ ভেবে বলে—সেনাপতি—

—কার সেনাপতি ?

—রাজার।

—কোন রাজার ?

—বিলেতের।

—বাঃ বাঃ—হারুণ-অল-রসিদ বোগদাদী, বেশ ইতিহাসের জ্ঞান তোমার।

বোগদাদের খবর কি ?

—অ্যা ?

—বলি বোগদাদের খবর কি ?

হারুণ ভাবলে বোগদাদ হয়তো, তাদের গ্রামের ইংরেজী নাম। তাই সে

বলে—খবর ভালো, শ্যার।

হেডমাষ্টার ও ইন্সপেক্টর হো হো করে হেসে উঠলেন। এর মধ্যে হাসবার ব্যাপার কি আছে, হারুণ তা খুঁজেই পেলো না। বিপিন মাষ্টারের দিকে হঠাৎ ওর নজর পড়তেই দেখলে তিনি রোষকষায়িত নেত্রে ওব দিকে চেয়ে আছেন— যেন ওকে গিলে খাবেন এই ভাব।

হারুণ ভেবে পেলো না কি এমন অন্ডায় কাজ সে করে বোসলো।

বিপিন মাষ্টার নিশ্চয়ই চটেচে, ওর মুখে তার রেশ আছে।

ইন্সপেক্টর ওর দিকে চেয়ে বল্লেন—বেশ মজার ছেলোট, সো সিম্পল্।

হেডমাষ্টার বল্লেন—পাড়াগাঁয়ে বাডী, কিছুই জানে না।

—চলুন, অন্ড ক্লাসে যাওয়া যাক।

ঘণ্টাখানেক পরে হেডমাষ্টার এসে ওদের ক্লাসে বল্লেন—পুণ্যশ্লোক নূপতি হারুণ-অল-রসিদের নামে তোমার নাম। তাঁর কথা কিছু জানো? তিনি ছিলেন গরীবের মা-বাপ, ছদ্মবেশে প্রজাদের দুঃখ দেখে বেড়াতেন। শিখে রেখো।

বিপিন মাষ্টার ছুটির আগে ওদের ক্লাসে এসে বেত আফালন করে বল্লেন—সরে এসো এদিকে, মুখ্যর ধাড়ি। ক্লাসের মুখ হাসিয়েচ আজ। বেত লাগাই এসো—হারুণ কঁাদো কঁাদো মুখে এগিয়ে যেতেই হেডমাষ্টারের ঘর থেকে স্কুলের চাকর এসে বল্ল হারুণকে ইন্সপেক্টরবাবু ডাকচেন।

কি বিপদেই আজ পড়েচে ও। কার মুখ দেখে না জানি আজ সে উঠেছিল!

অফিসঘরে ওকে ইন্সপেক্টরবাবু জিগ্যেস করলেন—বাড়ি আপাতত কোথায়?

হারুণ ভয়ে ভয়ে বল্লেন—জানিপুর।

—কতদূর এখান থেকে?

—দু মাইল, স্মার।

—কি খেয়ে এসেচো?

—পাশ্চ ভাত ।

—মসরুর কোথায় ?

—আজ্ঞে ?

—খোজা মসরুর ?

নাঃ কি বিপদেই আজ ভগবান তাকে ফেললেন । এ সব কথা সে জীবনে কখনো শোনে নি । কেন এত বড় বড় লোক খাপছাড়া কথা বলে, যার কোনো মানে হয় না ? উত্তর দিতে না পারলে এখুনি বিপনে :মাষ্টার বেত উচিয়ে আসবে মারতে ।

হারুণের মুখ শুকিয়ে গেল । ও করুণ নয়নে একবার ইন্সপেক্টরবাবুর দিকে চেয়ে দেখে চোখমুখ নিচু করলে । একবার এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে বিপনে মাষ্টারটা ওঘরে কোথাও আছে নাকি । সকালের এঁচোড় পাড়া আজ একেবারে মাঠে মারা গেল ! অদৃষ্ট আর কাকে বলে ? নাম রেখেচেন তার বাপ মা, তার কি দোষ ?

কখন তার চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো ওর অজ্ঞাতসারে ।

ইন্সপেক্টরবাবু বল্লেন—কেঁদো না খোকা । যাও, বাড়ি যাও । তোমার নামটা খুব বড় একজন ভালো লোকের নাম । ইতিহাসের প্রসিদ্ধ লোক, বুঝলে, যাও—

স্কুল থেকে বাড়ি যাবার পথে আবুল বল্লেন—এঁচড় আজ না দিয়ে কাল দিলেই হোত । আজ তো পড়াই হোল না । তোকে কি বলছিল রে ইন্সপেক্টরবাবু ?

হারুণ বল্লেন—তুই পাডগে যা এঁচড় । বিপনে মাষ্টারকে আজ এখুনি চার-পাঁচখানা দিয়ে আসি । কাল নইলে আজকের শোধ তুলবে । কি মুন্সিলে পড়েছিলাম আজ বল্ তো !

বেলা দুপুর উত্তীর্ণ হয়ে গেলে দু'জনে বাড়ি পৌঁছল ।

সুলেখা

অজ-পাড়াগাঁয়ের পথে যখন গাড়ী ঢুকলো তখন সুলেখার কান্না এল। এই-সে কলকাতায় ইস্কুল-কলেজে পড়েছিল? এই পাড়াগাঁয়ে শ্বশুরবাড়ি হবে, যত অশিক্ষিতাদের মাঝখানে দিন কাটাতে হবে! কলকাতার নীলিমাদের বাড়ি গিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় চায়ের আড্ডা, সেখানে জগদীশ বড়ুয়া ও হিরণ্ময় মিত্র সম্বন্ধে আলোচনা, ভয়েল-কাপড়ের জমির ধারে কি রঙের পাড় সেলাই হবে এ-সম্বন্ধে গভীর গবেষণা, গৌরীদের বাড়ি গিয়ে রেডিওতে নতুন নতুন গান শোনা—সব শেষ হয়ে গেল। গানের সে ভীষণ ভক্ত। ভালো গান শুনতে পেলে আর কিছু সে চায় না।

এ-সবের এই পরিণতি?

এই জগ্রে কাকা তাকে ইস্কুলে দিয়েছিলেন? না দিলেও পারতেন। আরও অল্প-বয়েসে বিয়ে দিলেও চলতো। তার চোখ ফুটবার আগেই। কথাটা সে কাউকে বলতেও পারলে না, বলতে পারলে বোঝা নেমে যেতো অনেক।

স্বামীকে তার পছন্দ হয়েছিল।

স্বামী শ্রামবর্গ, অল্প বয়েস। বি-এ পাশও করেছে। কিন্তু হোলে কি হবে, তিনি বিদেশে চাকরি করেন, গল্প-গুজোব করবার জগ্রে তাঁকে পাওয়া যাবে না সব-সময়। অশিক্ষিতাদের মধ্যে অজ-পাড়াগাঁয়ে একা-একাই দিন কাটাতে হবে। মরে যাবে সে। নীলিমা কতদূরে পড়ে রইল, ও এবার আই-এ পাশ করবে—সামনে কত আনন্দভরা মুক্ত জীবন!

সে আটকে গেল, ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল-ঝাঁঝির দামে। জীবনের গতি ওর বন্ধ হয়ে গেল।

সফ্যা হয়েছে...

একটি জীর্ণ একতলা বাড়ির সামনে ওদের গাড়ি এসে পৌঁছলো। কতকগুলো প্রাচীনা, কতকগুলো পাড়ার্গেয়ে-বৌ, তাদের মুখে চোখে না আছে বুদ্ধির দীপ্তি, না আছে কিছু, তারাই এসে স্থলেখার চারিধারে ভিড় জমালে। কলকাতার বাসাতেই বৌভাত হয়ে গিয়েছিল। কোনো আচার-অনুষ্ঠান বাকি ছিল না, থাকলে আরও বিরক্তিকর হয়ে উঠতো ব্যাপারটা।

স্বামীর ছুটি নেই। তিনি তাকে পৈতৃক-বাড়িতে প্রাচীনাদের হাতে পৌঁছে দিয়েই সরে পড়লেন। মিলিটারি চাকরি, বিশেষ ছুটিছাটা নেই। যদি সময় পান, পূজোর সময় আসবো বলে গেলেন।

সমীর চলে গেলে, স্থলেখা কান্নায় ভেঙে পড়লো। একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেল সে। কিভাবে দিন কাটবে এখানে বুড়ীদের মধ্যে? যারা বাইরের সংগতের কোনো সংবাদ রাখে না এমন তিনকাল গিয়ে এককালে-ঠেকা দস্তহীন বুড়ীদের মধ্যে?

টাকা ছিল না কাকার। নতুবা শহরে বিবাহ হতো।

যাক সে কথা। ছেলে দেখে বিয়ে দেওয়া। ছেলে সত্যিই ভালো। স্বামীকে সে গর-পছন্দ করেনি। ভালো ছেলে, পাশ-করা, স্বাস্থ্যবান। গ্রামের বাড়ি জীর্ণ বটে, কিন্তু বেশ বড়। অনেক নাকি জায়গা জমি আছে, প্রজাপত্র আছে, আগান-বাগান, পুকুর, বাঁশঝাড় আছে। বনেদি সেকলে গৃহস্থ।

তবে ওই যা কথা, সেকলে...একেবারে সেকলে।

শাশুড়ি স্থলেখাকে দিয়েচেন একছড়া ভারি সেকলে মুড়কি-মালা হার। দিয়ে বলেছিলেন—বোমা, বড় পয়মন্ত জিনিসটা। আমার শাশুড়ি আমাকে এই হার দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, আমি তোমাকে দিলাম আবার। তুমি আবার দিও তোমার ছেলের বোকে—জন্মোএইজ্ঞী হও, আমার মাথায় যত চুল আছে ততদিন সমীর বেঁচে থাকুক।

সুলেখা শাশুড়ির পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। হারছড়াটা ভারি বটে, কিন্তু একালে ও-হার কেউ পরে? গৌরী কি ভাববে, কলেজের অমুদি কি ভাববে, যদি ও আজ মুড়কি-মালা হার গলায় দিয়ে কলকাতায় গিয়ে হাজির হয়? দিন-পাঁচ-ছয় কেটে গেল।

সুলেখাকে ভোরে উঠে কাজকর্ম বড়-জা নীরদাকে সাহায্য করতে হয়। অবিশ্রি নতুন বউ বলে এখনো কাজের ভার তেমন ঘাড়ে চাপেনি, কিন্তু নীরদাকে দিয়ে সে বুঝতে পারে এ-সংসারে পুরনো বউ হয়ে গেলে কি ধরনের খাটুনিটা আশা করা যায়।

নীরদা উদয়াস্ত খাটে, টিন-টিন ধান সেদ্ধ করে, বোঝা-বোঝা স্কার কাচে, খই মুড়ি ভাজে, দু-বেলা রান্না করতে আসে, এখন ওরা একবেলার ভার সুলেখার উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টায় আছে বোধ হয়। নিতান্ত চক্ষুসজ্জায় বলচে না।

সুলেখা রাঁধতে জানে না যে তা নয়—কিন্তু গৌরী-রান্না চচ্চড়ি, স্কুনি, মোচার ঘণ্ট, ঝালের ঝোল, বড়ির টক—এসব সে রাঁধতে জানে না। তাছাড়া ভালোও লাগে না এসব তার। এ-ভাবে জীবন নষ্ট করার কি মানে হয়?

সুলেখা সুন্দরী মেয়ে, কলেজের থিয়েটারে গতবার মালিনীর পার্ট নিয়েছিল। সুলী চেহারার জন্তে আর চমৎকার গানের গল্লা জন্তে যা মানিয়েছিল ওকে! গৌরীর মা টিসুশাড়ি পরিয়ে, সোনার গহনা দিয়ে, কপালে অলকাতিলকা এঁকে ওকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিলেন—ইংরাজির অধ্যাপিকা তরুণী উষাদি গ্রিন্-ক্রমে এসে ওকে কিভাবে অভিনন্দিত করলেন—এসব কথা তো আর-বছর রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের দিনের!

আজ মনে হচ্ছে কত কাল...

সে-সব দিন শেষ হয়ে গেল।

এর চেয়ে তার না-ই বা বিয়ে হতো? থাকতো সে উষাদি'র মত, মালিনীদি'র মত, মিস সেনের মত, মিস বিধুবালা গাঙ্গুলির মত অবিবাহিতা।

হাতে ভ্যানিটি-ব্যাগ ঝুলিয়ে, খাটো ছাতা-হাতে ট্রাম ধরতে ছুটতো ঠিক বেলা সাড়ে দশটায়। যেখানে খুসি তুমি যাও, সিনেমা ছাখো, নাচগানের জলসা ছাখো ফাষ্ট-এম্পায়ারে—কি মজা!

সকালবেলা। ওর বড়-জা এসে বললে—রাঙা-বৌ, এক কাজ করতে হবে যে!

সুলেখা বললে—কি দিদি!

—কলাইয়ের ডাল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এগুলো ছাদে নিয়ে গিয়ে রোদে দাও, তারপর বেলা পড়লে ঝেড়ে তুলতে হবে। বুঝলে?

—বেশ।

—পারবে তো?

—করিনি কখনো, তবে চেষ্টা করি।

সুলেখা ডাল ছাদে দিয়ে এসেছে, তারপর আর ডালের কথা ওর মনে নেই। দুপুরে আহারের পরে একটু শোবামাত্র ওর ঘুম এসেছে। বেলা ছুটোর সময় কালো-ভোমরার মত মেঘ ক'রে নেমেচে ঝন্ ঝন্ জল। ও অঘোরে ঘুমুচ্ছে তখন। ঘুম যখন ভেঙেচে, তখনও সমানে বৃষ্টি হচ্ছে। শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি খানা-ডোবা ভর্তি করে ফেলেচে ছু'ধন্টার মধ্যে। সুলেখা উঠে চোখ মুছতে-মুছতে জানালা দিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেল। বৃষ্টির এমন রূপ সে সহরে দেখেনি কখনো। বকুল গাছের গুড়িটা কালো দেখাচ্ছে বৃষ্টির ধারায়। ছাতারেপাখীগুলো অঘোরে ভিজচে—এ যেন রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটার কথা মনে এনে দেয়—

এদের কোনো ব্যবস্থা নেই। এই সময় খেতে হয় গরম-গরম চা। সে নতুন-বৌ, চা তৈরি করতে যেতে পারে না। কিন্তু কারো কি সেদিকে দৃষ্টি আছে, না কেউ কিছু বোঝে?...ও-মাগো, ওদের বাড়ির বুড়ীটা কি ক'রে ভিজচে এই জলে নারকোলপাতা কুড়ুতে। পাড়ার্গেয়েদের কাণ্ডই আলাদা।

এমন সময় ওর জা ঘরে ঢুকে বলল রাঙা-বৌ, ডালগুলো তুলেছিলে ছাদ থেকে ?

সর্বনাশ ! সেকথা একদম মনে নেই সুলেখার। লজ্জায় তার সুন্দর মুখ লাল হয়ে উঠলো, অপ্রতিভ-সুরে বলে—ওই যাঃ! সেকথা মনেই নেই দিদি... এফুনি আমি যাচ্ছি ছাদে...

লজ্জায় সুলেখার মনে হচ্ছিলো যে, মাথা কুটে মরে।

এই সব অশিক্ষিতার দল তাকে কিরকম আনাড়িই না মনে করচে। যাকে 'স্মার্ট' ব'লে সবাই জানতো কলেজে। সুলেখা ধড়মড ক'রে উঠে ছুট দিল ঠাদের দিকে, ওর জা সম্মুখে ওর দিকে চেয়ে বলেন—ছুটতে হবেনা রাঙা-বৌ, বোসো—বোসো।

—বসবো কি দিদি, ডাল যে ভিজে নষ্ট হয়ে গেল !

—সে কি এখনো ছাদে আছে ভাই ? তুমি ঘুমুচ্ছিলে যখন বিষ্টি এল, সে আমি তুলে আনলুম যে।

কৃতজ্ঞতায় সুলেখার সুন্দর চোখের দৃষ্টি বিনত হয়ে এল। সত্যি ভালো লোক বটে, তার জা। মজা দেখবার মত লোক নয়। ও বলে—বাঁচলুম দিদি। ধন্যবাদ। তুমি আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচালে। সুলেখা জা মুখে কাপড় দিয়ে হেসে বলে—রাঙা-বৌয়ের থিয়েটারি-ধরণের কথা শুনে হেসে মরি ! ও-মাগো ..

এ একটা মস্ত বড় পরাজয়ের দিন ব'লে সুলেখা মেনে নিজে।

ডাল কখনো তোলেনি সে, অতশত তার মনে থাকে না পাড়ারগায়ের লোকের মত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ও-পাড়ার কামিনী এসে বলে—কি হ'চ্ছে গো বৌদিদি ?

—চুল বাঁধছি, এসো ঠাকুরঝি। চুলের দড়িটা ধরো তো।

—গান করবে ?

—সন্দে-বেলা গান করলে, শাশুড়ি আমায় ভালো চোখে দেখবেন ? একেই তো আনাড়ি হয়ে আছি এ-বাড়ির মধ্যে । সে হবে না ভাই । তবুও তুমি আজ প্রথম বলে গানের কথা ।

—কেউ বলেনি বুঝি তোমায় বৌদিদি ?

—কে আর বলচে ।

এইসময় সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো ঘন হয়ে...কামিনী চলে যাবার জন্তে বাইরে এসে দাঁড়ালো । বলে—চলি আজ বৌদিদি, আর একদিন আসবো ।

এক-পসলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েচে সেদিন বিকেলে । স্থলেখার ঘরের জানালার ঠিক বাইরে নেবুগাছে নেবুফুল ফুটেচে—বৃষ্টিসজল অপরাহ্নের বাতাসে ভুরভুরে নেবুফুলের গন্ধ....

বড় জা নীরদা ওর ঘরে ঢুকে বলে—কি হচ্ছে রাঙা-বৌ ?

—আসুন দিদি । কি আর হবে, এমনি বসে আছি ।

—রান্নাঘরে চলো । ছটো ডাল ভাজবো, তুমি বসে বসে কুলোয় ঝাড়বে ।

—আচ্ছা দিদি, সবসময় এসব কাজ তোমাদের ভালো লাগে ? একটু অন্য রকমের কাজ—একটু ভালো কাজ...

নীরদা হেসে বলে—সময় নেই ভাই । দেখচো তো সংসারের কাজ নিরন্তর বেহাতি ।

—ওরই মধ্যে সময় ক'রে নিতে হয়...

বিরক্তিতে স্থলেখার মন ভরে উঠলো । এমন সব অশিক্ষিতাদের মধ্যেও সে এসে পড়েচে ! এরা শুধু জানে, ডাল ভাজতে আর ভাত রাঁধতে । শুধু খাওয়া আর খাওয়া ।

নীরদা বলে—তুমি তো রাঙা-বৌ নতুন এসেচো । এখন প্রথম প্রথম

তোমার খারাপ লাগবে—এরপর এই আবার লাগবে ভালো। তখন অল্প কিছুতে মন যাবে না।

সুলেখা মনে-মনে বললে—সে দিন আমার জীবনে হঠাৎ না আসুক।

চক্ষুজ্জ্বাল খাতিরেও ওকে গিয়ে ডাল ভাজতে বসতে হোলো রান্নাঘরে। দু’টি ঘণ্টা সে কি খাটুনি! নীরদা ডাল ভেজে দিচ্ছে আর ও আনাড়ি-হাতে কুলোতে ঝাড়চে। অনেক রাত্রে ঘুম-চোখে সুলেখা এসে যখন বিছানায় শুয়ে পড়লো, তখন তার মন অবসাদে ও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়চে। কি কর্মফলে এমন সংসারে সে এল?

অনেক রাত্রে সেদিন ঘুম ভেঙে উঠে সুলেখা গুনলে কে গান গাইচে...

সুলেখা উৎকর্ষ হয়ে শোনবার চেষ্টা করলে—গুন্ গুন্ ক’রে কে গান ভাঁজচে—নিপুণ-কণ্ঠের আলাপ। ও ভাবলে—বা রে, এমন জয়জয়ন্তী আলাপ করে কে?

সুলেখা নিজে গায়িকা। সে বুঝলে, যে এই গুন্ গুন্ সুরে আলাপ করচে, সে নিপুণা গায়িকা। সুলেখা অমন আলাপ করতে পারলে নিজেকে ওস্তাদ মনে করতো। কিন্তু এ কি সম্ভব?

এখানে কে গান গাইবে এমন?

সুলেখা আরও শোনবার জন্তে বাইরে এসে দাঁড়ালো, সেই সময় গানও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। যে গাইছিল, সে অগ্রমনস্কভাবেই এক-টুকরো গান অল্প একটু সময়ের জন্তে গাইছিল—ঠিক গান গাইবার জন্তে নয়।

সুলেখা ঘুম ও বিশ্বয়জড়িত-চোখে এসে শুয়ে পড়লো। সকালে উঠে এ-ঘটনার কথা ওর মনে ছিল না, কিন্তু একটু বেলা বাড়লেই মনে এলো রাত্রেই সেই অস্পষ্ট জয়জয়ন্তীর সুর। তখুনি সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলে সমস্ত ঘটনাটা। স্বপ্নের ব্যাপার হয়তো সমস্তটা...

গ্রামের ও-পাড়ায় সুলেখা কখনো যায়নি। এবার একদিন ও-পাড়া থেকে

কয়েকটি মেয়ে ওকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেল। তারা সকলেই একবাক্যে সুলেখার রূপের প্রশংসা করলে, ঢা খেয়ে বসে রান্না-বান্নাব গল্প করলে। এরা চোখ থাকতে অন্ধ নাকি? এমন যে সুন্দর লাইলাক-রঙের জরিপাড় শাড়ি পরে আছে সুলেখা, তার দিকে কারও চোখ গেল না? কেউ বললেনা সে-কথা? না বললে বিখ্যাত ছবি 'মায়ামুকুর' সম্বন্ধে পুঁড়িয়ে-খেতে একটা বাক্য। সুলেখা ষ্ণদের কাছে 'মায়ামুকুর'এর গল্পটা করেছে, ওর সব গানগুলিই সে গাইতে পারে এ-কথাও জানিয়ে দিয়েছে, অথচ—গান গাইতে বললেও না তাকে কেউ! হিরণ্ময় মিত্রের গান সবগুলো—কে জানেনা হিরণ্ময় মিত্রকে, তাঁর স্কর্টকে?

সুলেখার ইচ্ছে হোলো, এই মূঢ় অশিক্ষিতা মেয়েগুলোর সামনে একবার হারমোনিয়মটা টেনে নিয়ে 'চাঁদের দেশের রাজকুমারী'র কিংবা 'এবার ফাল্গুন এলে এসো এসো'র অপূর্ব সুর-পুঞ্জ ঘর ভরিয়ে দেয়।

কারণ, যে-বাড়িতে ওকে নিয়ে গিয়েছিল, একটা ভাঙা হারমোনিয়ম ছিল সে-বাড়িতে। একটি এগারো-বারো বছরের ছোট মেয়ে বেসুরে একটা সেকলে-শ্রামাসঙ্গীতও গেয়েছিল--বোধহয় তাকেই বিশেষ ক'বে শোনার জন্মেই। এ-গ্রামে কেউ বোধহয় খবর রাখে না যে সে একজন গায়িকা?

বাড়ি ফিরে দেখলে, ওর জা তালের বড়া ভাজবে ব'লে তালের রস বার করছে। ওকে দেখে বলে—রাঙা বৌকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে তোমরা?

মেয়ের দল বলে—তুমি তো আর যাবে না বড়বৌদি, তুমি গেলে অবিশ্বি আজ খুব ভালো হতো। আমাদের সে ভাগ্যি কি আর আছে?

নীরদা বলে—বোস্ সবাই। তালের ফুলুরি খাবি। রাঙা-বৌ, তুমি তালের গোলাটা করো, আমি কড়ায় তেল চড়িয়ে দিই।

একটি ধামা বড়া ভেজে যখন ওরা উঠলো তখন রাত ন'ট। মেয়ের দল ইতিমধ্যে ছ'দশটা বড়া খেয়ে চলে গিয়েছে। সুলেখার এসব কাজ অভ্যাস

নেই। ঠায় বসে থাকা রান্নাঘরের গরমে কতক্ষণ পোষায়? এরা শুধু জানে, ভোজনের তরিবৎ কবতে সকাল থেকে বাত বাবোঁটা পর্যন্ত।

মনে পড়লো, ওদের কলেজের এক অধ্যাপক বলেছিলেন, বাঙালীর ঘবে রান্নার বন্দোবস্ত যে ধরনের, তাতে খাটুনি এবং আয়োজন যত বেশী, খাদ্যবস্তুর পুষ্টিকাবক গুণ তত নেই। জিবে ভালো লাগানোর দিকে যত লক্ষ্য, খাত্তের গুণাগুণের দিকে তত লক্ষ্য থাকলে আজ বাঙালীর স্বাস্থ্য এত খারাপ হতো কি?

ব'সে ব'সে শুধু নির্মোদেব মত এক বাশ তালের বড়া ভাজা...

ওব বড়-জা রান্নাঘরে ব'সে ওকে বলে—বাঙা-বৌ, আমার ঘব থেকে গামছাখানা নিয়ে এসো না ভাই, গা ধুবে নিই কুয়োতলা থেকে। বড় গরম লাগচে বড়া ভেজে।

সুলেখা বলে—আলো আছে তোমাব ঘবে?

—নেই। হারিকেনটা নিয়ে যাও ভাই।

বড়-জা'ব ঘবে ঢুক গামছা খুঁজতে গিয়ে সুলেখার চোখে পড়লো একটা জিনিস।

ঘবের ছোট্ট টেবিলটার ওপবে একখানা খাম পড়ে আছে, 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' ছাপা আছে তাব ওপবে। খামটাতে নাম লেখা আছে, নীরজাসুন্দরী মিত্র, বায়গ্রাম, বাহিবগাছি পোষ্ট, জেলা নদীয়া। তাডাতাড়ি সে খামখানা খুলে ফেলে পড়লে—সতেবোই আগষ্ট তারিখে নীরজাসুন্দরী মিত্রের গান আছে বেডিওতে, তারই চিঠি ও কনট্রাক্ট ফর্ম। উল্টে-পাল্টে দেখলে সুলেখা, কোনো ভুল নেই কোথাও। নির্ঘাত বেডিও-কনট্রাক্টের চিঠি।

কিন্তু কার নামে? নীরজাসুন্দরী মিত্র কে? একটা অস্পষ্ট সন্দেহ ওর মনে জাগলো। তাই যদি হয়? তখুনি সে রান্নাঘরে ছুটে এসে চিঠিখানা দেখিয়ে বলে—এ কার চিঠি, দিদি? নীরজাসুন্দরী কে?

ওর জা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে—দূর! ও-আবার তুমি দেখতে গিয়েচো? আমারই নাম। নীরজা থেকে পাড়াগাঁয়ে সবাই বলে—নীরদা।

—কিন্তু মিত্র কেন? ঘোষ হবে তো?

—বিয়ের আগের নামটাই চলে আসচে রেডিও-আপিসে। ওরা আর বদলায় নি। ও কিছু নয় ভাই—রেখে দে। ঠাকুরপোকে বারণ করে দিইছিলাম, নতুন বোঁকে একথা বোলো না, আমার লজ্জা করে। তাহাড়া আমার দাদার বারণ ছিল, শ্বশুরবাড়ির গ্রামে এসব কথা জানালে কে কি বলবে। দাদা আমাকে গান শিখিয়েছিলেন কিনা? হিরণ্ময় মিত্র, নাম শুনেচ বোধহয়?

বিখ্যাত গায়ক হিরণ্ময় মিত্রের ছোট বোন ও শিষ্যা স্নগায়িকা নীরজাসুন্দরী মিত্র তার সামনে বসে তালের বড়া ভাজচে! স্নলেখা শঙ্কায় ও স্নেহে নিজের আঁচল দিয়ে বড়ো জা'র মুখ মুছে দিতে দিতে বলে—একদিন দিদি জয়জয়ন্তী ভাঁজছিলেন তা'হলে আপনিই অনেক রাতে? ঘুমের ঘোরে শুনে সে দিন... পায়ের ধুলো দিন...তখন আমি ধারণাই করতে পারিনি। এতদিন বলা আপনার উচিত ছিল আমাকে। আমি কি করে জানবো?

., রূপো-বাঙাল

আমি সকালে উঠেই চণ্ডীমণ্ডপে যেতাম হীক মাঠারের কাছে পড়তে ।

আজ ঘুম ভাঙতে দেবী হওয়ায় মনে হোল কাল অনেক রাতে বাবা বাড়ী এলেন মরেলডাঙা কাছারী থেকে । আমরা সব ভাইবোন বিছানা থেকে উঠে দেখতে গেলাম বাবা আমাদের জন্তে কি কি আনলেন ।

চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনে পা দিতেই রূপো কাকা আমাদের বকে উঠলো—এ্যাঃ রাজপুত্রুর সব উঠলেন এখন ! মারে গালে এক এক চড় যে চাবালিটা এমনি যায় ! বলি, করে খাবা কি ভাবে ? বামুনের ছেলে কি লাঙল চষতি ঘাবা ?

বাবা বাড়ী থাকতেও কি রূপো কাকা আমাদের চোখ রাঙাবে ?

দাদা ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে—রাতে ঘুম হয়নি রূপো কাকা ।

— কেন রে ?

— ছারপোকাকার কামড়ে । বাব্বাঃ, যা ছারপোকা খাটে ।

— যা যা তাড়াতাড়ি পড়তে যা ।

রূপো কাকা আমাদের আত্মীয় নয়, বাবার বন্ধু নয়, বাড়ীর গোমস্তা কি নায়েব নয়, এমন কি রূপো কাকা হিন্দু পর্য্যন্ত নয় । রূপো কাকা আমাদের কৃষাণ মাত্র । মাসে সাড়ে তিন টাকা মাইনে পায় ।

রূপো কাকার আসল নাম রূপো বাঙাল, ও জাতে মুসলমান । আমাদের গাঁয়ের চৌকিদারও ও । পিসিমার মুখে শুনেচি রূপো কাকা নাকি সাজ্জিমাটির নৌকাতে চড়ে ওর কুড়ি বাইশ বছর বয়সের সময় দক্ষিণ দেশ থেকে আমাদের গ্রামের ঘাটে নিরাশ্রয় অবস্থায় এসে নেমেছিল । কেন এসেছিল দেশ থেকে তা শুনিনি । সেই থেকে আমাদের গ্রামেই রয়ে গিয়েচে—বিদেশ থেকে এসেছিল বলে উপাধি 'বাঙাল'—এ উপাধিরই বা কারণ কি তা বলতে পারব না ।

রূপো কাকা আমাদের বাড়ীর কৃষাগিরি করচে আজ ন'দশ বছর। আমাদের ও জন্মাতে দেখেচে। কিন্তু সেটা আশ্চর্য্য কথা নয়, আশ্চর্য্যের কথা হচ্ছে এই যে, ও আমার বাবাকে নাকি কোলে করে মানুষ করেছে। অথচ রূপো কাকাকে দেখলে তেমন বুড়া বলে মনে হয় না।

আমারই ঠাকুরদাদা হরিরাম চক্রবর্তী গাডুহাতে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সায়েবের ঘাটে কই মাছ কেনবার জন্তে। রূপো কাকা সাজিমাটির নৌকাতে বসে ছিল। ওর অবস্থা দেখে হরিরাম চক্রবর্তী ওকে গ্রামে আশ্রয় দেন। সে সব অনেক দিনের কথা। রূপো কাকার বয়স এখন কত তা জানি না, মোটের উপর বুড়া। ঠাকুরদাদা মারা যখন যান, বাবার তখন পঁচিশ বছর বয়েস। বাবাকে তিনি নায়েব পদে বহাল করে গেলেন জমিদার বাবুকে বলে কয়ে। সেই থেকে বাবা আছেন মরেলডাঙা কাছারীতে। আর বাড়ীতে বিষয় সম্পত্তি দেখা শোনা, প্রজা, খাতকপত্র এ-সব দেখা শুনা করার ভার ঐ সাড়ে তিনটাকা মাইনের কৃষাগ রূপো কাকার ওপর।

আমাদের অবস্থা ভালো গ্রামের মধ্যে—এ কথা সবার মুখেতে শুনে এসেছি জ্ঞান হয়ে অবধি। বড় বড় চার পাঁচটা ধানের গোলা। এক একটিতে অনেক ধান ধরে। কলাই মুগ অজস্র। প্রজাপত্র সর্বদা আসচে খাজনা দিতে।

এ সব দেখা শুনা করে কে ?

রূপো কাকা সব দেখা শুনা করতো। আশ্চর্য্যের কথা, বাবা বিশ্বাস করে এই সামান্য মাইনের মূর্খ কৃষাগকে এত সব বিষয়-আশয় দেখবার ভার দিয়ে নিশ্চিত ছিলেন।

বাবাকে সবাই ভীষণ ভয় করে চলতো ; মুখের ওপর কথা বলতে সাহস করতো না কেউ। কিন্তু রূপো কাকা বাবাকে বলতো—বলি, ও বাবু, তুমি যে এসো বাড়ীতি ন' মাস ছ' মাস অন্তর, এতটা বিষয় দেখে কে বল তো।

আদায় পত্র ত এ বছর কিছু হোল নি। হাতীর পাঁচ পা দেখেচো নাকি ?
এত বড সংসারটা চলবে কিসি ?

বাবা দু'মাস অস্থব দু'তিন দিনের জগ্য বাডী আসেন।

বাবার অনুপস্থিতিতে গোলার চাবি খুলে রূপো কাকা ধান পাড়তো, কলাই
মুগ পাড়তো। খাতকদেব বর্জ দিতো। নিজের দরকাব হোলে নিজেও
নিতো।

আমরা সব ছেলেমানুষ কিছুই বুঝি নে। ঠ'কুরমা প্রবীণা বটে, কিন্তু
ভালোমানুষ। বিষয়-আশয়ের কিছুই বুঝতেন না। আমাদের আছে সব, কিন্তু
দেখে নেবার লোক নেই।

সে অবস্থায় সব কিছুর ভার ছিল রূপো কাকার ওপর।

বাবা বাডী এসে পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে বসতেন মহাজনী খাতা খুলে।

বলতেন—কে কি নিয়েচে রূপো ?

রূপো কাকা বলতো—লিখে রাখো, সনাতন ঘোষ ছ'কাঠা কলাই দু'কাঠা
বীজ মুগ, কড়ি ছ'কাঠা—

—আচ্ছা।

—হয়েচে ? আচ্ছা লেখো—বীজ মণ্ডল দু'বিশ ধান, কড়ি পাঁচ সলি—

—আচ্ছা।

—হয়েচে ?

—হয়েচে।

—রূপো বাঙাল একবিশ ধান দু'কাঠা কলাই—

—আচ্ছা।

—হয়েচে ?

—হয়েচে।

—লেখো, কাটু কলু চার কাঠা কলাই, কড়ি চার কাঠা। ময়জদি সেখ,

ধান এগার কাঠা, কড়ি সাত কাঠা। এইভাবে রূপো কাকা অনর্গল বলে চলচে গত দু'মাসের মধ্যে কর্জ দিয়েচে যাকে যতটা জিনিস। ওর সব মুখস্ত, কোনো কিছু ভোলে না। ওরই হাতে গোলার চাবির খোলো। যাকে যা দরকার দিয়ে সব মনে করে রেখে দিয়েচে, বাবার খাতায় লেখাবার জন্তে।

একদিন একটা ঘটনা ঘটলো।

রূপো কাকার জ্বর হয়েছিল, আমাদের বাড়ীতে আসেনি দু'তিন দিন।

এমন সময় বাবা বাড়ী এলেন মরেলডাঙা থেকে। এসেই বিকেলে রূপোকে ডেকে পাঠালেন। রূপো জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে বললে—বলো গে যাও, আমি জ্বরে উঠতি পারচি নে। এখন যেতি পারবো না—জ্বরে মরচি। তা সীতানাথ আর আসতে পারলে না পায়ে পায়ে? তার একটু এলে কি মান যেতো?

বাবা বাবু মাহুষ। নতুন বাবু, রূপো বাধানো ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়ান, কোঁচা হাতে নিয়ে। ঘড়ির চেন ঝোলে বুকে, হাতে থাকে বাকমকে আংটি। প্রজাপত্রের কাছে খুব খাতির। বাবাকে যখন লোকে ফিরে এসে একথা ব'লে, তখন বাবা একেবারে তেলে-বেগুনে উঠলেন জলে। কিন্তু তখন কিছু না বলে গুম্ব হয়ে রইলেন।

এর দিন পাঁচ ছয় পরে রূপো কাকা সেরে উঠে আমাদের বাড়ী এল। বাবা তখন চণ্ডীমণ্ডপে বসে হিসেবের খাতাপত্র দেখছিলেন। একে দেখেই কড়া স্বরে বলে উঠলেন—রূপো!

—কি?

—তুমি মনে মনে কি ভেবেচ জিগ্যেস করি? তোমার এতবড় আম্পর্কী, তুমি বলো আমি পায়ে পায়ে তোমার বাড়ি যাবো? তুমি জানো, কার সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছ? তোমার মুণ্ডটা যদি কেটে ফেলি তা হলে খোঁজ হয় না তুমি জানো? এত বড়লোক তুমি হোলে কবে?

রূপো কাকাও সমানে গলা চড়িয়ে উত্তর দিলে—তা তুমি মাথা কাটবে না?

এখন কাটবে না? এখন কাটবে বৈকি! হ্যাঁরে সীতেনাথ, তোকে যে কোলে করে মানুষ করেছিলাম একদিন, মনে পড়ে? এখন তুমি বড় হয়েচ, বাবু হয়েচ, সীতেবাবু—এখন তুমি আমার মুণ্ডু কাটবা না? বড় গুণবস্ত হয়েচিস তুই, হ্যাঁ সীতেনাথ—‘তুমি’ ছেড়ে রূপো কাকা, সাগাণ্ড সাড়ে তিন টাকা মাইনের কর্মচারী হয়ে মনিবকে ‘তুই’ বলেই সম্বোধন আরম্ভ করলে সকলের সামনে।

বাবা বল্লেন—যা যা বকিস নে—

—না বকবো না—তুই বড় তালেবর হয়েচিস আজকাল, বড় বাবু হয়েচিস—তুই আমার মুণ্ডু নিবি না তো কে নেবে?

বলেই রূপো কাকা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেল্লেন।

আমার ঠাকুরমা ছিলেন বাড়ীর মধ্যে। রূপোর কান্না শুনে তিনি বাইরে ছুটে এসে বাবাকে যথেষ্ট বকলেন।

বাবা বল্লেন—তা বলে আমায় ওরকম বলে কেন?

ঠাকুরমা বল্লেন—তুই কাকে কি বলিস সীতে, তোর একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই? তুই কি ফেপলি?

বাবা কলম ছেড়ে বাড়ির মধ্যে উঠে এলেন, তারপর রূপো কাকার হাত ধরে বল্লেন—রূপোদা, তুই কিছু মনে করিস নে। আমার বলা ভুল হয়ে গিয়েচে, বড় ভুল হয়েচে।

রূপো কাকার রাগ কমে না, বল্লেন—না, আমার দরকার নেই কাজে। চের হয়েচে। নে, তোব গোলাব চাবিছড়া রেখে দে—মুই আর ওসব ঝামেলা পোয়াতে পারবো না। নে তোর চাবিছড়া।

কতবার বোঝান হলো, রূপো কাকা কিছুতেই শুনবে না। চাবির খোলো সে খুলে বাবার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

শেষে বাবা বল্লেন—বেশ, তা হলে আমিই বাড়ি ছেড়ে যাই। রইল গোলা পালা, প্রজাপত্র। আমি কাল সকালের গাড়ীতেই বেরুচ্ছি—

রূপো কাকা ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে—তুই চলে যাবি তা তোর কাচ্চাবাচ্চা মানুষ করবে কেডা ?

—কেন, তুমি ?

—মোর দায় পড়েচে । তোরে কোলেপিঠে কবে মানুষ করলাম বলে কি তোর ছেলেপিলেও কোলেপিঠে করে মানুষ করবো ? আমি কি আর জোয়ান আছি ? এখন বুড়ো হইচি না ? ওসব ঝামেলা আমার দ্বারা আর হবে না—

—না আমি আর থাকবো না । কালই যাবো চলে ।

—কোথায় যাবি ?

—মরেলডাঙা চলে যাবো । ঠিক বলচি যাবো । আমার বড্ড কষ্ট হয়েছে রূপোদা, তুমি আমায় এমন করে বলে শেষকালে ? আমি গৃহত্যাগী হবো, হবো, হবো— বলেই বাবা ফেলসেন কেঁদে ।

রূপো কাকা অমনি উঠে এসে বাবার হাত ধরে বলে—কাঁদিস নে সীতেনাথ, কাঁদিস নে, ছিঃ—মুই আর তোরে কি বললাম ? তুইই তো কত কথা শুনিযে দিলি—কাঁদিস নে—

শেষে দুজনেরই কান্না ।

আমরা ছেলেমানুষ, অবাক হয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম তুই বড লোকেব কান্না । দাদা আমায় কনুয়ের গুতো মেরে মুখে হাত চেপে হি হি করে হেসে উঠলো । আমরা অবিশি দূরে গোলার নিমতলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম ।

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত অবিশি মিটমাট হয়ে গেল । বাবাও দেশত্যাগী হোলেন না, রূপো কাকাও চাকরী ছাড়লেন না ।

রূপো কাকা রাত্রে চৌকিদারী করতো । অনেক রাত্রে আমাদের বাড়ি এসে ঠাকুমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলতো—ওঠো বৌমা, জাগন থাকো । রাত খারাপ । চণ্ডীমণ্ডপে সন্নিসি ঘোষ ও হীক মাষ্টার গুয়ে থাকতো, তাদের জাগিয়ে

দিয়ে বলতো—একেবারে অত নাক ডাকিয়ে ঘুমোও কেন ? ওঠো, মাঝে মাঝে তামুক খাও আর গোলাগুলোর চারিধারে বেড়িয়ে এস না—

একটা অদ্ভুত দৃশ্য কতদিন হীরু মাষ্টার দেখেচে ।

আমাদের গল্প করেছে সকালবেলা ।

সব গ্রাম ঘুরে এসে অনেক রাতে চৌকিদারী পোশাক পরে লাঠি হাতে রূপো কাকা অন্ধকারে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের নৈঠার ওপর বসে থাকতো ।

এক একদিন হীরু মাষ্টার বাইরে এসে ওকে দেখতে পেয়ে জিগ্যেন করতো—কে বসে ?

—মুই রূপো ।

—বসে কেন ? এত রাতে ?

—তোমরা তো দিব্যি ঘুমোচ্ছ, তোমাদের আর কি ? গোলার ধান যাবে, সীতেনাথের যাবে । চোরের যা উপদ্রব হয়েছে তার খবর কি জানবা ? মোর ওপর ঝঙ্কি কত ! মোর তো তোমাদের মত ঘুমুলি চলবে না । সীতেনাথের এ ঝামেলা আর কদিন পোয়াবো । এবার এলি চাবিছড়া তার হাতে দিয়ে মুই খোলসা হবো । এ আর পারি না বুডো বয়সে রাত জাগতি—

হীরু মাষ্টার বলে— ঘুমোও গে যাও -

—কিন্তু মুই যে তোমাদের মত নিশ্চিন্ত হতে পারিনি তার কি হবে । ধান-গুলোর ঝঙ্কি যে মোর ঘাড়ে ফেলে সে বাবু দিব্যি চাঙা হয়ে বসে আছেন । এবার আশুক, কিছুতেই আর এ বোঝা ঘাড়ে রাখচি নে মুই ।

কিন্তু নিজের ইচ্ছেতে তার ছাড়তে হয়নি । বৃদ্ধ বয়সে তিন দিনের জ্বরে রূপো কাকা আমাদের গোলার দায়িত্ব নামিয়ে চলে গেল । এও সাত-আট বছর পরের কথা । আমরা তখন স্কুলে পড়ি । সবমুহুরে ত্রিশ দ্বত্রিশ বছর ও ছিল আমাদের বাড়ী ।

বাবার সাথে গিয়ে আমরাও দেখতে পেলাম রূপো কাকাকে ।

রূপো কাকার ছোট চালাঘর। একদিকে ডোবা, একদিকে বাঁশঝাড়। ছেঁড়া মলিন কাঁথা মূড়ি দিয়ে শীর্ণ, শাদা দাড়ি রূপো কাকা পুরাণো মাছুরে শুয়ে। রূপো কাকার ছেলের নাম বেজা, লোকে বলে বেজা বাঙাল। বেজা আমাদের দেখে বললে—আমুন বাবুরা, দেখুন দিকি বাবারে? জ্ঞান নেই, ভুল বকচে—

বাবা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বল্লেন—ও রূপোদা? কেমন আছ, ও রূপোদা—

রূপো কাকা চোখ মেলে বল্লেন—কেডা? সীতেনাথ? কবে এলে?

—এই পরশু এসেচি।

—বেশ করেচ। এই শোনো, খাতার মুড়োয় লিখে রাখো, মুই চিঁড়ে খাবার বেনামুরি ধান নিইচি চার কাঠা, আহাদ মগুলা কলাই দু' কাঠা, বাড়ি দু' কাড়া, বিটু ধেরিসি ছ' কাঠা ধান, বাড়ি চার কাঠা—মোর ধান পোষ মাসের ইদিকে দিতে পারবো না বলে দিচ্ছি—ভুল যাবো, লিখে রাখো—

এই রূপো কাকার দায়িত্বের শেষ। আর কোন কথা বলেনি রূপো কাকা। সেদিন সন্ধ্যাবেলা রূপো কাকা আমাদের গোলাপালার দায়িত্ব চিরদিনের মত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

বিশ্বস্ত লোকেদের জন্তে কি কোনো স্বর্গ আছে?

যদি থাকে, আমাদের বাল্যের রূপো কাকার আসন অক্ষয় হয়ে আছে সেখানে।

আজ ত্রিশ বছর আগেকার কথা এসব। এই সব চোরাবাজারের দিনে, জুয়োচুরির দিনে, মিথ্যে কথার দিনে বড্ড বেশি করে রূপো কাকার কথা মনে পড়ে।

✓ তেঁতুলতলার ঘাট

হারুর আজ আর জ্বর আসেনি। এখন তার মনটাতে বেশ স্ফুর্তি আছে। জ্বর এলে আর স্ফুর্তি থাকে না। কিছু না কিছু নিরানন্দ আসেই। আজ চার মাস ধরে সমান ভাবে ম্যালেরিয়া জ্বর, পেট জোড়া পিলে, আর সর্বদাই ভয় ওই বুঝি জ্বর এলো।

অনেকেই শুকে দেখে বলে—ইস্! ছেলেটার মিত্যু দশা হয়েছে একেবারে। এবার বুঝি বা সরে। এ সব বলতো এমন সব লোকে, যারা শুকে ভালবাসার চোখে দেখে না। যে ভালবাসার চোখে দেখে, সে কি এমন কথা বলতে পারে! হারুও তা বুঝতো, বুঝে চুপ করে থাকতো। জ্বর আসাটা যেন ওর মস্ত বড় অপরাধ, এজন্তে সে একদিকে যেমন বাড়ীতে বাবা মা ও পিসিমার, অন্য দিকে পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছেও অপরাধী।

ওর মা বলে—সকলের হাড় জ্বালালি তুই বাপু, কারু সোয়াস্তি নেই তোর জন্তে। অথচ কেমন সুন্দর দিনগুলি। সুনীল আকাশ, অদ্ভুত ধরনের সুনীল আকাশ। মলমলে রোদ পড়েচে পথঘাটের ছধারে বনে ঝোপে। রাস্তাঘাট এখনো খট খট করচে। আজ দিন কুড়ি একদম বৃষ্টি বন্ধ। চাষারা রোজ গাজিতলায় রোজ-পালুনি করচে। আল্লা আল্লা বলে মাঠে বুক চাপড়ে চীৎকার করচে, বৃষ্টির চিহ্নও নেই। মেঘই নেই আকাশে তার বৃষ্টি। ধান এবার হবে না সবাই বলচে।

এই সব দিনে প্রত্যেক ঝোপে, প্রত্যেক লতার তলায় যখন রোদ পড়ে, যখন মউটুস্কি পাখী বন-চন্দনা লতার আগায় মুখ উঁচু করে দোল খায়, কটুগন্ধ ঘেঁটকোল ফুলের দল ঝোপে ঝাড়ে ফোটে, তখন ঘর আর বার একাকার হয়ে যায়, ঘরে মন বসে না।

হারু তখন পাশের বাড়ীর চুহুর আর মণ্টুর বাড়ী যায়।

মণ্টু মায়ের জন্তে ডাঁটা শাক তুলচে ওদের বাড়ীর সামনের ক্ষেতে। ওকে দেখে বলে—কিরে, আজ জ্বর আসেনি তোমার ?

যেন তার জ্বর আসাটা প্রভাতকালে সূর্যোদয়ের মত একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। কেন যে ওরা জ্বরের কথাটা মনে করিয়ে দেয় ! হারু বলে—না, জ্বর কিসের ? চল্ বেড়িয়ে আসি।

—মাকে ডাঁটাগুলো দিয়ে আসবো। তুই একটু দাঁড়া।

—এ খেত করেছে কে ?

—তুই জবে পড়ে ভুগবি, দেখতে তো আসবি নে ? এবার এ খেত আমি করেচি। মা বলে, ডাঁটা করে রাখ্ জমিটাতে, তাই জমিটা করলাম।

হারুর মনে দুঃখ হোল বার বার তার জ্বর আসার উল্লেখ করাতে। একবার এত রাগ হোল, সে বেড়াতে যাবে না কারুর সঙ্গে ; একাই সে পথে পথে আগেও খেলা করতো, এখন জ্বর হওয়ার পর থেকে মনটা কেমন হয়ে পড়েচে, একা বেড়াতে ভয় ভয় করে, আগে যে সাহস ছিল, এখন আর সেটা নেই। নয়তো মণ্টুর মত সঙ্গীকে সে গ্রাহ্যও করে না।

ছুজনে অবশেষে বেরিয়ে গেল নদীর ধারে। কাঠ-কাটা নৌকো এসেচে পূর্ব দেশ থেকে, বড় বড় গুঁড়ি পড়ে আছে এদিকে ওদিকে। বর্ষাকালে অনেক গুঁড়ির গায়ে তেলাকুচো লতা উঠেচে, হু একটা তেলাকুচো ফলও ফলেচে।

কি এমন মায়া যে জায়গাটার !

হারুর বড় ভাল লাগে। খেলা করবার মত জায়গা।

মণ্টু ও হারু কতক্ষণ সেখানে খেলা করলে, খেলা করবার উৎসাহ কারো কম নয়। তেলাকুচা লতার ফল মণ্টু তুলতে গেলে হারু তুলতে দিলে না। কেন, বেশ তো ছলচে লতার আগায়, একটা আধপাকাও হয়েছে, তুলবার কি দরকার ? বেশ দেখাচ্ছে গাছে। বেনে বৌ জোড়ায় জোড়ায় বেড়াচ্ছে কাল কাহ্নে গাছের ঝোপে ঝোপে।

কতক্ষণ কেটে গিয়েছে ছুজনের কারো খেয়াল নেই।

মণ্টু কাছে গিয়ে বলে—অমন করে বসলি কেন রে? জ্বর এল না কি?

—নাঃ—

—দেখি গা—ওরে বাস্‌রে, গা যে পুড়ে যাচ্ছে—বাড়ি যা বাড়ি যা—

হারু বিমর্ষভাবে বলে—তুই জ্বরের কথা অত করে মনে করে দিলি কেন? আমি ভুলে ছিলাম বেশ। যেমন তুই মনে করিয়ে দিলি, অমনি আমার জ্বর এল।

মণ্টু বলে—না, না রে, তোর এমনিও জ্বর আসতো, আমি মনে করে দেওয়ার জন্তে কি আর জ্বর এল?....ও তোর ভুল কথা। চ, বাড়ী চ—

বাড়ীতে আজ চিংড়ি মাছ দিয়ে লাল ডাঁটার চচ্চড়ি হচ্ছে সে দেখে এসেছে। কলাইয়ের ডাল দিয়ে ওই চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খেতে যে লাগে!

মাকে না বলেই হোল যে জ্বর হয়েছে। মণ্টুকে পথ থেকেই সরিয়ে দেওয়ার জন্তে বলে—তুই বাড়ি যা—আমি একা যেতে পারবো—

—যেতে পারবি ঠিক?

—খুব। ভারি তো একটুখানি জ্বর। ও এখনি সেরে যাবে। তুই যা—

হারু বাড়ী ফিরে দেখলে রান্না এখনো হয়নি। কিন্তু দেরি করতে গেলে চলবে না, সে জানে এর পরে এমন ভীষণ কম্প উপস্থিত হবে যে রোদে গিয়ে বসতেই হবে, নয় তো লেপ মুড়ি দিয়ে গিয়ে শুতে হবে। গায়ে কাঁটা দেবে, বমি হবে। স্তবরাং ভাত যদি খেতে হয় তবে আর দেরি করা উচিত হবে না, এখনি খেতে বসা উচিত।

মা জ্বর এসেছে বুঝতে পারলেই সব মাটি। আর ভাত দেবে না। ও রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়ে নির্বিকার ভাবে বলে—মা, খিদে পেয়েছে।

—কোথায় গিয়েছিলি রে সকাল বেলা?

—খেলা করছিলাম নদীর ধারে।

ইচ্ছা করেই সে মণ্টুর নাম করলে না। যদি এরা তাকে ডেকে পাঠায় বা

এমনি কিছু, তবে সে বলে দেবে জ্বরের কথা। সে বলে—ভাত ছাও খিদে পেয়েচে—

—আজ এত তাড়া কেন ?

—আমার যা খিদে পেয়েচে !

—এখনো চচ্চড়ি হয়নি। শুধু ডাল আর ভাত নেমেচে—

—তাই দাও, তাই দিয়েই খাবো—

ভাত খেতে বসে হারুর মনে হোল, না খেতে বসলেই ভাল হোত। জ্বর চেপে আসচে। শীত এত বেশি করচে যে রোদে না বসলে আর চলে না। উঃ দাঁতে দাঁত লাগচে এমন শীত ! ভাত খেয়েই সে গিয়ে বাড়ীব পেছনে নিমগাছটার তলায় রোদে বসলো। একটু পরে ওর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপুনি ধরলো, এদিকে রোদে পিঠ পুড়ে যাচ্ছে, কেমন একটা ঘোব ঘোর ভাবে ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে। হারু বুঝলে ভীষণ জ্বর এসেচে ওর।

ওর মা বলে—বসে আছিস কেন রোদে ? শরীর খারাপ হয়নি তো ?

—হঁ।

—হঁ মানে কি ? জ্বর আসচে ? সরে আয় ইদিকে দেখি, পোড়ার মুখো ছেলে, তবে ভাত খেলি কি মনে করে ? এমন করে ভুগে মরবি কদিন ?

বেশ। যেন তারই দোষ। তার যেন ইচ্ছে যে রোজ জ্বর আসে। বাপ মায়ের অভ্যেস সব দোষ ছেলের ঘাড়ে চাপানো। হঁস হোল যখন ওর আবার, তখন বেলা গিয়েচে। রাঙা রোদ কাঁটাল গাছটার মাথায়। শালিক পাখীর দল ভাঙা পাঁচীলের ওপর কিচ্ কিচ্ করচে। ওর মুখ তেতো হয়ে গিয়েচে, মাথা ভার, চোখে কেমন ঝাপসা ভাব।

ও বলে—কি খাবো মা ?

—কি আবার খাবি ? ভাত খেয়ে জ্বর এসেচে, খাবি কি আবার ? সাবু করে দেবো রাত্তিরে।

হারু নাকি সুরে বলে—না, সাবু আমি খাবো না—হুঁ-উ-উ—
 —না সাবু খাবে না, তোমার জন্মে আমি পিঠে পুলি করি। চূপ করে গুয়ে থাক।
 ভোর রাতে ঘাম দিয়ে হারুর জ্বর ছেড়ে গেল। তার পর ঘুম ভেঙে যায়।
 শরীর খুব হালকা মনে হয় এবং খুব খিদে পায়। অত রাতে আর কে কি খেতে
 দেবে, সে চূপ করে গুয়ে থাকে ভোরের আশায় এবং ভোরের আলো খড়ের
 ঘরের দেওয়ালের মাথা দিয়ে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও মাকে ডাক দিতে
 লাগলো। ওর ঘুমকাতুবে মা চোখ না মেলেই এপাশ ওপাশ ফিরে বলতে
 লাগলো—বাবাঃ সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরে একটু যে শোবো সে জ্বো
 নেই। একটু চোখ বুজিয়েছি অন্ননি ষাঁড়ের মত চিৎকার!...হাড় ভাজা ভাজা
 হয়ে গেলো!

হারু নাকি-সুরে বলে—সবে চোখ বুজেচো বুঝি! রোদ উঠে গিয়েচে
 গাছপালার মাথায়। আমার খিদে পেয়েচে—উঠে ঝাখো কত বেলা—

অদৃশ্য এও অতিশয়োক্তি। রোদ ওঠেনি, সবে ভোরের আলো ফুটেচে
 মাত্র! ওর মা ওঠবার বিশেষ কোন আগ্রহ দেখালে না। ছেলের এ নাকি সুরে
 চীৎকার সকাল বেলায় দিকে এ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। হারু খানিকটা কান্নার
 পরে আপনি চূপ করে।

বিছানা ছেড়ে উঠতেই বেশ আনন্দ লাগে। আজ কি সুন্দর দিনটা। কেমন
 পাখীর ডাক বাঁশ গাছের মগডালে। কাল হারুর মা বলছিল আজ কুমড়োকাটা
 সংক্রান্তি। যে যার গাছ থেকে যা পারবে চুরি করবে—শসা, লাউ, কুমড়া—
 যার যা ইচ্ছে, কেউ কিছু বলতে পারবে না বা সাহসও করবে না।

অন্য কিছু নয়, গানি বুড়ির উঠোনের মাচায় সেই যে শসা গাছ! চমৎকার
 শসার জালি হুলচে কঞ্চির আড়ালে আড়ালে। কতবার লোভ হয়েছে ওর, কিন্তু
 বুড়ী বড় সতর্ক। আজ ওবেলা রাতের অন্ধকারে একটা দা হাতে গোটা পাঁচ
 ছয় শসার জালি আর গোটা শসাকে যদি সাবাড় করা যায়...

উৎসাহে বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়লো।

মণ্টুদের বাড়ি গিয়ে এখনি পরামর্শ করতে হবে। খাওয়ার কথা সে ভুলেই গেল। এত কাগ্না, এত অনুযোগ যে খাওয়ার জন্তে।

এক ছুটে সে পৌঁছল মণ্টুদের বাড়ি। মণ্টু ওর জ্যাঠামশায়ের পাশে বসে সকালবেলা মুড়ি খেতে খেতে ধারাপাত মুখস্থ করছিল। হারুক দূর থেকে আসতে দেখে সে বিশেষ কোন উৎসাহ প্রকাশ করলে না, কারণ এখন জ্যাঠামশায়ের হাত এড়িয়ে খেলতে যাওয়া অসম্ভব।

সৌভাগ্যের কথা মণ্টুর জ্যাঠামশায় এই সময় তামাক সাজতে গেলেন বাড়ীর মধ্যে।

হারুক ছুটে এসে বললে—আজ কী দিন মনে আছে ?

মণ্টু পেছন দিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করে বললে—কী দিন ?

—কুমড়ো কাটা আমাবশ্তে—

—কে বললে ?

—সকলকে জিগোস করে গাখ—

—কি করবি ?

—তুই আর আমি বেরুবো। গানি বউয়ের বাড়ি সেই শসা গাছ আছে তো ? আজ রাত্তিরে সব শসা—কি বলিস ?

—তুই এখন যা, জ্যাঠামশায় আসচে, ওবেলা আমি ভোদের বাড়ি যাবো।

হারুক সতৃষ্ণ নয়নে ওর মুড়ির বাটির দিকে চেয়ে বললে—কি খাচ্ছিস ?

—মুড়ি।

—দে না একগাল ?

এবার হারুক কানেও জ্যাঠামশায়ের খড়মের শব্দ পৌঁছেচে। সে তাড়াতাড়ি কাপড়ে অকারণ ডান হাতখানা গুছে মণ্টুর সামনে পেতে বললে—শীগুগীর দে, তোর জ্যাঠামশায় আসচে। পরক্ষণে এক মুঠো মুড়ি মুখে পুরে দিয়েই সে ছুটে

পালানো। মনেভাবলে—বুড়া এসে পড়লেই বকতো, আমায় দেখতে পারে না মোটে। কি কেপ্পন মণ্টুটা! একগাল মুড়ি কত ক'টা দিলে ছাথো—দিব্যি মচমচে মুড়ি—

তারপর সে বাড়ী পৌছে দেখলে তার মা সামনের উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। খাবার দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ও উত্তোগ কিছুই নেই এ বাড়ীতে।

মা ওই এক রকমের লোক হারু জানে। অণু লোকের মায়ের মত নয়। কাল রাতে যে খাইনি, জানো সবই, ছাও না বাপু খেতে সকাল সকাল। কাণ্ড-খানা বেশ! একটু বেলা হোলে মা যদিও খেতে দিলে, সে মাত্র একবাটি সাবু। সে প্রতিবাদ করতে গেলে ওর মা বাঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—ই্যা তোমাকে লুচি ভেজে দিই, পিটেপুলি গড়িয়ে দিই, কাল সারারাত জরে শুষোছো কিনা!

যেন জর না হোলেই মা তাকে লুচি ভেজে আর পিটেপুলি করে খাওয়ায় আর কি! সে এ বাড়ীতে নয়। এ বাড়ীর বাঁধা আছে চালভাজা, তিনশো-ত্রিশ দিন। লুচি!

কিন্তু ভাত? মা কি আজ ভাতও খেতে দেবে না নাকি? কথাটা সে ঘুরিয়ে জিগ্যেস করলে।

—ভাত খাওয়ার সময় আমার সেই গাওয়া ঘি একটু দিতে হবে কিন্তু—

—ভাত খাবে কে?

—কেন, আমি।

—ইস্! বলে, কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগায় ঘুন্টি দিতে—সারারাত জরে কঁা কঁা কবে ওনার ভাত না খেলে চলবে কেন।

—কি খাবো তবে?

—শিউলিপাতার রস তো খেলিনে সকালবেলা। একটু বেলা হোলে দেবো অখন পাতা বেটে—আর সাবু।

হারু মিনতির সুরে বললে—না সাবু নয়, দুখানা রুটি, মাছের ঝোল দিয়ে। তোমার পায়ে পড়ি মা—পুরনো জর তো, ওতে কিছু হবে না।

—আচ্ছা যাক্, দেখবো অখন।

স্মৃতরাং মনে আর একবার খুসির ঢেউ উঠলো হারুর। শরীর তার খুব হালকা হয়ে গিয়েছে, জ্বর না এলেও পারে। সকলে বলে শরীর হালকা হয়ে গেলে জ্বর আর নাকি হয় না। সে একা মাঠের ধারে বোষ্টম বাগানের পথে বেড়াতে গেল। ও বাগানের খুব নিবিড় একটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে আছে সেই বড়ো মাদার গাছটা এক বার রজুন কাকার দলে মিশে সে গিয়েছিল সেখানে। রজুন কাকা অদ্ভুত লোক, বড় বয়সের ছেলে, ওর গোঁপ দাড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল, তবু ও তাদের সঙ্গে খেলতো। কত নতুন নতুন খেলা শিখিয়েছিল। তার দলে খেলতে বেরুলে শুধুই মজা, কত রকমের মজা। কিন্তু রজুন কাকা চলে গেল কোথায়, একদিন হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল এ গাঁ থেকে, ছবাব পূজো এসেছে গিয়েছে তারপর—আর আসেনি।

মাদার গাছটা খুঁজে পাওয়া গেল না। ভিজে ঝোপ-ঝাপ—কত পটপটি ফল ছলচে গাছে গাছে। বড় বড় পটপটি ফল। আজকাল সব ছেলেই বর্ষা-দিনে পটপটি ফল ছোঁড়ে, তাদের শিখিয়েছিল সেই রজুন কাকা। একটা বাঁশের চোঙের মধ্যে পটপটি ফল পুরে একটা কাঠি দিয়ে ঠেলে দিলেই ফট্-ফটাস্! যেন বন্দুকের শব্দ! তাই ওর নাম পটপটি ফল।

আজকাল সবার হাতে ছাখো একটা বাঁশের চোঙ আর কাঠি আর পটপটি ফলের গোছা। রজুন কাকা না থাকলে আজ আর কাউকে পটপটি ছুঁতে হোত না।

ছটো বড় বড় তিৎপল্লার ফুল ফুটেছিল উঁচুতে। লতার-আগে ছলচে। হাত বাড়িয়ে নাগাল পাওয়া যায় না। এক থোলো পটপটি ফলই নিয়ে যেতে হবে কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সে কোনটাই সংগ্রহ করতে পারলে না। বেলা হয়েছে অনেক, খিদেও বেশ পেয়েছে।

বাড়ী গিয়ে কুটি আর মাছের ঝোল খাবে—কি মজা! এতক্ষণ কুটি হয়েও

গিয়েচে। সে রোগা মানুষ, যা নিশ্চয়ই তার জন্তে আগে করে রাখবে। আজ সে বেশ ভাল আছে, আজ আর জ্বর আসবে না। জ্বর বোধ হয় সেরে গেল। একটু একটু খুব সামান্য শীত বোধ হচ্ছে, কিন্তু সেটা জ্বরের দরুন নয়। বর্ষাকাল, আর এই বনঝোপে তো রোদ পড়ে না তাই, মণ্টুরও শীত করতো, যদি সে আঙ্গ এই বনে ঢুকতো।

হারু ঝোপের বার হয়ে ছায়াবহুল সরু বনপথ ছেড়ে চওড়া রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। এই চওড়া রাস্তা ওদিকে নাকি কেষ্টনগর পর্য্যন্ত চলে গিয়েচে, বাবার মুখে সে শুনেচে। একসারি ধান বোঝাই গরুর গাড়ী মন্থর গতিতে আসচে ওদিক থেকে। হারু একটা পিটুলি গাছের তলায় আধ রোদ আধ ছায়ায় বসে বসে গরুর গাড়ী দেখতে লাগলো।

বোধহয় একটু বেশীক্ষণ বসে হয়ে গেল। যে সময় উঠবে ভেবেছিল, সে সময় ওঠা হোল না। রোদটা বেশ মিষ্টি লাগচে। না, জ্বর হয়নি তার। বর্ষাকালে রোদ সকলেরই ভাল লাগে।

বাড়ীতে যখন সে পৌঁছলো, তখন বেলা বারোটা। হাতে তার গোটাকতক পিটুলি ফল। ওর মা বল্লে—ওমা, ই কি কাণ্ড! এই বলে গেলি খিদে পেয়েচে, আমি কখন রুটি করে বসে আছি। কোথায় ছিলি? ভাল আছিস তো?

—হঁ—

—কোথায় ছিলি?

—মাদার পাড়তে গিয়েছিলাম বোষ্টমদের বাগানে।

—জ্বর হয়নি তো?

—না—

কিন্তু ওর কথার ধরণ আর চোখ মুখের ভাব ওর মায়ের কাছে ভালো বলে মনে হোল না। কাছে ডেকে বল্লে—তোর চোখ মুখ রাঙা দেখাচ্ছে কেন রে?

ইদিকে সরে আয় গা দেখি—বাপরে, গা পুড়ে যাচ্ছে। যা শুয়ে পড় গিয়ে, আর খেতে হবে না।

যখন ওব জরের ঘোর কাটলো, তখন রাত হয়েছে। হারু চোখ মেলে চেয়ে দেখলে তন্তুপোষের কোণে দেওয়ালের গা ঘেসে রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলছে, ঘরে কেউ নেই। জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। তখনকার খিদে এখনও রয়েছে। সে কিছু খায়নি দুপুর থেকে। মা কোথায় গেল? সে ক্ষীণ স্বরে ডাকলে—ও—মা—আ—আ—

কেউ উত্তর দিলে না। মা রান্নাঘরে কাজ করবে বোধহয়, কিংবা হয়তো পাশের নিতাই কাকার বাড়ী গিয়েছে।

একটু পরে ওর মাকে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখে ও একটু অবাক হয়ে গেল। মা এমন করে হাঁটচে কেন? আমসত্ত্ব চুরি করবে নাকি? সে তো আমসত্ত্ব চুরি করবার সময় অমনি.....মা এসে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে দেখতে গেল। চোখ তাকিয়ে থাকতে দেখে যেন একটু অবাক হয়ে গিয়ে নরম মোলায়েম স্বরে বললে—বাবা হারু! কেমন আছ বাবা?

—ভালো।

—দেখি?

ওর গায়ে হাত দিয়ে ওর মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—ওঃ কি ঘাম ঘেমেচিস! এঃ, সব যে ভিজ্জে গিয়েছে। হারুও তা লক্ষ্য করলে বটে। কাঁথা ভিজ্জে সপ সপ করছে। ও বললে—মা, আমার খিদে পেয়েছে।

—খিদে পেয়েছে বাবা? আচ্ছা দেবো এখন। আহা বাবা আমার, সোনালি আমার, শোও। আসচি আমি। মা ঘর থেকে চলে গেলে ও ভাবলে মা এমন নরম হয়ে গেল কেন? অল্প সময় মা তো খেতে চাইলে বলে ওঠে—জ্বর ছাড়তে না ছাড়তে খিদে। ছেলের কেবল খিদে আর খাই খাই, জ্বর হয়েছে, চুপ করে শুয়ে থাক।

কিন্তু মা আজ অমন মিষ্টি, অমন মোলায়েম সুরে কথা বলচে কেন? পা টিপে টিপে হাঁটা...হঠাৎ হারুর মনে পড়ে যায় আজ না সেই কুমড়োকাটা আমাবশ্তে! ওঃ ভাল কথা মনে পড়েচে। এখন সব সন্দেহ, তার তো জ্বর ছেড়ে গিয়েচে। এইবার মট্টুকে ডেকে নিয়ে গানি বুড়ির বাড়ী শশা চুরি করতে যেতে হবে! আরও একটু রাত হোক। ততক্ষণ সে খেয়ে নিক।

ওর মা একটু বালি নিয়ে ঘরে ঢুকে বলে—এটুকু খেয়ে নাও তো বাবা! উঠো না, শুয়ে থাকো লক্ষি ছেলে—ও লক্ষি ছেলে আমার—

ও বিস্মিত সুরে বলে—কেন, আমার সে ওবেলাকার রুটি? আমি খেয়ে শশা কাটতে যাবো এক জায়গায়।—আজ কুমড়োকাটা আমাবশ্তে বে! জানো না?

ওর মা বিহ্বল ভাবে ঘাড় নেড়ে বলে—খুব জানি বাবা, তুমি শোও। কুমড়োকাটা আমাবশ্তে গিয়েচে কাল—তুমি এই দুদিন ধরে বেহঁস। মা মঙ্গলচণ্ডী, সারিয়ে ছাও মা, সেরে গেলে পূজো পাঠিয়ে দেবো বটতলার—

ছোড়হাতে বটতলার উদ্দেশে ওর মা প্রণাম করে।



দুই দিন

রামনগর বারোয়ারি তলায় আজ খুব জাঁকের যাত্রা। কলকাতা থেকে দল এসেছে, বেশ বড় দল। রসিক বাঁড়ুঘোর যাত্রার দল, যার নাম এ অঞ্চলের লোকের যথেষ্টই শোনা, কিন্তু এত বড় দল কি পাড়াগাঁয়ে আসে যখন তখন? এবার বহু চেষ্টার ফলে ওদের আনা হয়েছে। রামনগর উচ্চপ্রাথমিক পাঠশালা থেকে ফেরবার পথেই কাতু এ সংবাদটি জোগাড় করে এনেছে। এ নিয়ে অনেক কথাবার্তাও হয়ে গিয়েছে কাতু ও তার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে।

ননী ওদের বাড়ি এল পেয়ারা পাড়তে। কাতুব বাবা দুর্গাচরণ মজুমদার চোখে দড়ি বাঁধানো চশমা পরে বাইরের ঘরে বসে জমিজমাসংক্রান্ত কাগজপত্র দেখছিলেন।

ননীকে দেখে বললেন—কি?

দুর্গাচরণ বড় কড়া প্রকৃতির মানুষ। ননী ভয়ে ভয়ে বলল—জ্যাঠামশায়, কেতো আছে?

—কেন? কি দরকার তোমার?

—জ্যাঠামশায়, ছোটো পেয়ারা পাড়বো?

—তা পাড়বে না কেন? তোমাদের জন্মেই তো গাছ করে রাখা। কেন পাড়বে না?

ননীর সাহসে কুলোল না পেয়ারার সম্বন্ধে কোন কথা তুলতে। সে চলে যাচ্ছে বাড়ির বার হয়ে, এমন সময়ে কাতু তাকে দেখতে পেয়ে বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে এল।

ননী বলল—ভাই, তোর বাবা পেয়ারা পাড়তে দিলে না—

কাতু আশ্বাস দিয়ে বলল—বাবা এখনি উঠলো বলে। নসবাপুর যাবে

খাজনার ভাগাদা করতে। সেই ফাঁকে তুই আর আমি পেয়ারা পাড়বো।
আজ রাত্রে যাত্রা শুনতে যাবি নে ?

— তুই যাবি ? দল খুব ভালো, না ?

— ও বাবা। কলকাতার বড় দল, দেখিস কি চেহারা, কি সব সাজগোজ,
কি গান—

— তুই কি করে জানলি ? দেখিচিস নাকি ?

— সবাই বলচে রামনগরের বাজারে। দুশো টাকায় এক রাত—আর
আমাদের বেলেডাঙার দল আর-বছর ত্রিশ টাকায় এক রাত গাইলে—রামোঃ
কিসের সঙ্গে কিসের কথা। দুশো টাকা আর ত্রিশ টাকা !

কাতু আর ননী খুব হেসে উঠলো এক চোট। তাদের মনে হলো এমন
একটা মজার কথা তারা কখনো বলেনি বা শোনবার সুযোগ পায়নি। উৎসাহের
চোটে কাতু রসিক বাঁড়ুয়োর দলের গুণাগুণ অনেক বাড়িয়ে বলে। তাদের দলের
ভীম যে সাজে তাকে নাকি সে দেখে এসেচে, এক হাঁড়ি ভাত ডাল তার সামনে
বেড়ে দেওয়া হয়েছে, তা সে একা খাচ্ছে। তার চোখ দুটো লাল ভাঁটার মত,
দেখলে ভয় হয়। গলার সুর কি ! যেন বাঘের গলার আওয়াজ। ওদের তলোয়ার-
গুলো কিন্তু সত্যিকার তলোয়ার, অগ্ন অগ্ন বাজে দলের মত রাঙা বা টিনের নয়।

বলা বাহুল্য এ সবের কিছুই কাতু দেখে আসেনি। সে অবিশ্রি যাত্রা
দলের বাসাতে গিয়ে দেখেছিল অনেকগুলো লোক কলার পাতা পেতে ভাত
খেতে বসেচে, তার মধ্যে কোন্টা ভীম কোন্টা নকুল কোন্টা বেদব্যাস সে তার
কিছুই জেনে আসে নি।

ননী সব শুনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে—তোর বাবা তোকে নিয়ে যাবে।
আমায় আমার মামা যেতে দেবে না। মামা যদি দেয়, মামীমা তো খাঁড়া উঠিয়ে
আছে ! আমার বড় ইচ্ছে যেতে।

তুই বন্ধুতে পরামর্শ করলে। ওরা যাবে নিশ্চয়ই। ননীকে যদি মামা না

যেতে দেয় তবে সে লুকিয়ে যাবে কাতুর বাবার সঙ্গে । দুইজনেরই বুক ছড় ছড় করচে কি হয় কি হয় ।

সন্ধ্যার আগেই দুর্গাচরণ মজুমদার চাদর কাঁধে ফেলে লাঠি হাতে নিয়ে লঠন ঝুলিয়ে যাত্রা শুরুতে বেরলেন । কাতু গেল বাবার সঙ্গে, কিন্তু ননী বেচারীর মামা প্রসন্ন না হওয়ায় তার বাড়ির বাইরে পা দেওয়া সম্ভব হোল না ।

কাতুর মন বেলুনের মত ফুলে উঠেচে । এখুনি সে রসিক বাঁড়ুঘোর যাত্রা দেখতে পাবে এখানে !

এ অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হবে এখুনি !

কতকগুলো লোক এসে আসরে আলো জ্বলে দিয়ে গেল । লোকের ভিড় জমে গেল আসরে । বহুদূর দূরান্তর থেকে লোক দেখতে এসেচে রসিক বাঁড়ুঘোব যাত্রা, তাদের হাতে চি ডেব পুটুলি, বগলে তামাক টিকের ঠোঙা । আসরের বাইরে এক একখানা ধান ইট পেতে সবাই বসে গেল ।

আসরে বাগুঘনু আনা হোল । সুর বাঁধা, টুং টাং করতে আধঘণ্টা কাটলো । কাতুর ধৈর্যের বাধ ভাঙে ভাঙে । রাজা সেজে কতক্ষণে আসবে । ও বাবাকে জিন্মোস করলে—কি পাল্লা হবে বাবা ?

দুর্গাচরণ অগ্র এক ভদ্র লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন, ধমক দিয়ে বলেন—দেখো এখন কি হবে । আমি কি জানি ? দুর্গাচরণ যে লোকটির সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি বলেন—সত্যি আজ এদের কি প্লে হবে জানো ? নলদময়ন্তী এদের নামকরা প্লে, ছাখে কি হয় ।

এমন সময় পালার প্রোগ্রাম বিলি হোল আসরে । কাতু তার বাবার খানা চেয়ে নিলে । তারপর পড়ে দেখেই বিস্ময়ে আনন্দে বাবাকে দেখিয়ে বলেন—বাবা, এই দেখো নলদময়ন্তীর পাল্লা হবে । নলদময়ন্তী বাবা—দেখো না ? ও বাবা—নল দময়ন্তী —

—আঃ নলদময়ন্তী তা কি করতে হবে ? নাচবো ? চুপ করে বসে ছাখে ।

যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল। বিস্ফারিত চোখে কাতু এবদৃষ্টে চেয়ে দেখলে পঞ্চ-
নল জাঁকজমকের সঙ্গে সন্ধ্যা চুমকির কাজ করা জরিপ পোষাক পরে সভাস্থল
আলো করে বসেচে।

কি তাদের হাত পা নাড়ার কায়দা, কি তাদের ওরবারি আফালন!

ইন্দ্রের সঙ্গে বরুণের কথা কাটাকাটির কি বাহার!

আর গান? এমন সুন্দর সুরের গান এ পর্য্যন্ত সে শোনেনি পাডাগাঁয়ে।

দৃশ্যের পর দৃশ্য বদলে চলেচে। প্রত্যেক দৃশ্যে অভিনব ঘটনার সমাবেশ,
নতুন নতুন সুরের গান, নতুন নতুন সুন্দর মুখ। পরীর মত মেয়েরা। মেয়ে
নয়, ওরা পুরুষ, কাতু জানে না যে এমন নয়, কিন্তু হু একটি মেয়ে সম্বন্ধে কাতু
ঠিক বুঝতে পাবলে না ওরা ছেলে, না সত্যিই মেয়ে।

সে বাবাকে বললে—বাবা, ও বাবা—

ভূর্গাচরণ বল্লেন—কি? কেন কথা বলচো? চুপ করে থাকো।

—ওরা মেয়ে না ছেলে?

—চুপ করে বসে থাকো। বকো না।

কাতু তন্ময় হয়ে গিয়েচে, তার বাহুজ্ঞান নেই। একটা দৃশ্য তার মন নেচে
উঠলো। এবার বোধহয় যুদ্ধের আয়োজন চলবে। কলিরাজ যে সেজেছে তার
কি বিকট চেহারা আর সাজসজ্জা। সত্যিই লোকটা খারাপ নাকি? নিশ্চয়
লোকটা খুব বদমায়েস। বুড়ো কঞ্চুকী কি হাসিয়েই গেল।

এইবার একটা করুণ দৃশ্যের অবতারণায় সভার লোক কেঁদে ভাসিয়ে দিল,
সেই সঙ্গে কাতুও।

রাজ্যহারা নল বনে দিশাহারা অবস্থায় একটা বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়েছেন
(বৃক্ষতলে আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারটা অবিশিষ্ট নলের বক্তৃতার মধ্যে দিয়েই প্রমাণ
পেয়েচে, কেননা তিনি বসে আছেন আসরের ঝাড় লগ্ননের তলায়), সঙ্গে রয়েছেন
নিরাভরণা দময়ন্তী। প্রোগ্রামে আছে অলক্ষ্যে বিধিলিপির সঙ্গীত—নলের

করণ বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আসরের সকলে উকিঝুঁকি মেরে দেখে
বিধিলিপি সাজঘর থেকে বেরুল কিনা।

কাতু অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে উঠেচে।

কিন্তু ঠিক যে সময় একটি বালককণ্ঠের মধুর সঙ্গীতের সুরে আসর ভরে
গিয়েচে, দেখা গেল ধীরে ধীরে বিধিলিপি গান গাইতে গাইতে আসরে ঢুকচে,
সেই সময় দুর্গাচরণ মজুমদার হাই তুলতে তুলতে বলেন—চলো অনেক রাত
হয়েচে। যাওয়া যাক। বাড়ি চলো—ছাতি নাও হাতে—

কাতু অবাক। বাবা কি সত্যিই বাড়ি যেতে চায়? ঠিক এই সময় মানুষে
পারে আসর ছেড়ে বাড়ি চলে যেতে? কাতু বলে—বাবা, এখন বাড়ি যাবেন
কি বলছেন? আমি যাবো না বাবা।

—না না চলো। ও আর কি দেখবে সারারাত জেগে। রাত দশটা। ওই
নাকে কান্না চলবে এখন সারা রাত। চলো, চলো—ছাতিটা নে হাতে—
ভিড়ে হারিয়ে যাবে। কাল আবার জেয়ালাতে খাজনার তাগিদে যেতে হবে
ভোরে।

চলে আসতেই হোল। উপায় নেই কাতুর। ওর চোখে জল ভরে এল।
বাবার ওপর বিরাগে ওর মন তিক্ত হয়ে উঠেচে। কেমন লোক বাবা? কিছু
বোঝে না। এমন সুন্দর জায়গা—!

রাগে সে বাবার সঙ্গে কথা বলে না সারা রাত্তা।

পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর পরের কথা।

কার্ত্তিকচরণ মজুমদার সকালে উঠে কাগজপত্র দেখেন। কার্ত্তিকের
মহাজনী কারবার আছে, আড়ত আছে ধানের ও পাটের। গত পঞ্চাশের
মন্বন্তরে ধানচাল হাত ফিরতি করে বেশ কিছু লাভও করেচেন। তাঁর কর্মচারী
হরিপদ এসে বলে—বড় বাবু ছে-কাটি ক'খানা গাড়ি যাবে?

—যে ক'খানা জোগাড় হয়। মাল কত ?

—দাদনের মাল হবে পঞ্চাশ মণ। আর ইদিক ওদিকে যা জোগাড় হয়।

—পাঁচখানা এখান থেকে নিয়ে যাও।

—লরির জন্তে শত্ৰুকে খবর দিতে বলে দেলাম।

—লরি একখানা নয়, দু'খানা। আমের গুঁড়ি যাবে সাতটা। চার টন।

—আপনি বেরুবেন কখন ?

—আমি খেয়ে দেয়ে বেরুবো। তুমি চলে যাও আগে—

এমন সময়ে কার্ত্তিক মজুমদারের দশ বছরের পুত্র নীলু এসে বল্লে—বাবা আজ থিয়েটার হবে রামনগরে। দেখতে যাবো বাবা।

থিয়েটারের নিমন্ত্রণপত্র কার্ত্তিক মজুমদার পেয়েছিলেন বটে, রামনগরের তরুণ সৎঘ আজ কি যেন একটা প্লে করবে তাতে লেখা ছিল। কিছু চাঁদাও তারা নিয়ে গিয়েছিল একদিন এসে। কিন্তু কন্মব্যস্ত কার্ত্তিকের সে কথা স্মরণ ছিল না।

নীলু বল্লে—বাবা যাবে তো ?

—দেখি আজ আবার অনেক গোলমাল। যেতে পারি কিনা দেখি।

—সে হবে না বাবা। তুমি না গেলে আমি যাবো কার সঙ্গে ? আমার দেখা হবে না। থিয়েটার কক্ষনো আমি দেখিনি—

—আচ্ছা, যা, সকালে উঠে এখন পড়গে যাও—সে তো ওবেলা, তার এখন কি ?

এই সময়ে পাটের মহাজন ফলেয়ার মাণিক মণ্ডল উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে

—বড় বাবু, আমার তার কি হোল ?

—কিসের ?

—আমার সেই মামলা আজ মিটিয়ে দেন বাবু।

—দেবো। আজ পঞ্চাশ মণ আনচি দাদনের মাল, আরও একশো মজুত।

তোমার ক'খানা লরি ?

—দুখানার বায়না দেওয়া আছে। মাল বেশী হোলে আরও একখানা

আনবো। আমার ছশোমণ জোগাড় করে দিতে হবে আপনার। একটু নেক-নজর করুন—

কার্তিক তাকে আশ্বাস দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন চা খেতে। কার্তিকের স্ত্রী বললেন—তা যাওনা একবার খোকাকে থিয়েটার দেখিয়ে আনো না? পাড়াগাঁয়ে ও সব জিনিস তো কখনো হয় না—এবার হচ্ছে যখন ওকে দেখিয়ে আনো। ও কখনো দেখেনি।

কার্তিককে অগত্যা যেতে হোল সন্ধ্যার সময় রামনগরের বাজারে, স্ত্রীর নিতান্ত পীড়াপীড়িতে। নতুবা ঝগড়া বাধে। কিন্তু মন তার ভাল ছিল না। কস্ম-চারীরা সংবাদ দিচ্ছে দাদনের পাট আশালুরূপ আদায় হয়নি। প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকা ছড়ানো রয়েছে চাষী মহলে ধান আর পাটের দাদন বাবদ। গত দুর্ভিক্ষের সময় চড়া দামে ধান চাল বিক্রি করে মোটা টাকা ঘরে এসেছিল বলেই এবার আশায় আশায় এত টাকা ছড়িয়ে দিলেন, কিন্তু বাজার হঠাৎ নেবে যাবে বুঝতে পারা যায় নি। ধানের দামও অত্যন্ত কম, পাটও তখৈবচ। তারপর অতগুলো ছড়ানো টাকার বদলে ধান বা পাট আদায় হোল না আজও।

নীলু দুধ-চিড়ের ফলার খেয়ে এসেছে। ছেলেমানুষের খিদে বেনা। কার্তিক কিছু খেয়ে আসেন নি, তিনি অর্থ উপার্জন-শক্তি অর্জন করবার সঙ্গে সঙ্গে পরিপাক-শক্তি হারিয়েছেন। রাত্রে খান দুখানা রুটি আর একটু দুধ। আগে খেতেন সূজির রুটি কিন্তু এখন যুদ্ধের বাজার ঘনীভূত অবস্থায় সূজী পাওয়া যায় না, আটার রুটিই খেয়ে থাকেন।

সন্ধ্যার পরেই থিয়েটার আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু চ্যাংড়া ছোকরা-দের ব্যাপার, হৈ চৈ করতে দুঘণ্টা কাটবার পরে রাত সাড়ে ন'টার সময় কনসার্ট বাজনা শুরু হোল। একালের থিয়েটারে ও সব অচল বলে কোন সহর-ঘোঁসা অতি-আধুনিক তরুণ সভ্য-আপত্তি তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত আপত্তি টেকেনি। কনসার্ট না বাজলে এ পল্লীগ্রামে থিয়েটার জমবে কেন?

কার্তিক ছেলেকে নিয়ে একেবারে সামনের আসনে বসেচেন। তার কারণ এ নয় যে তিনি ভালোভাবে অভিনয় দেখতে পাবেন সেই উদ্দেশ্যে।

এর প্রধান কারণ রামনগরের বাজারের প্রসিদ্ধ আড়তদার শরৎনাথ ওখানে বসেছে। শরৎনাথ এ অঞ্চলের বড় আড়তদার, তার পাশে বসে কার্তিক মজুমদার ব্যবসার কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি আসলে জানতে চান শরৎনাথের দাদন অনুযায়ী পাট ধান আদায় হচ্ছে কিনা। কেন এ বৎসর তাঁর এ বিপর্যয় ঘটলো।

শরৎনাথ ঘুঘু লোক, সে ব্যবসার প্রকৃত সংবাদ কাউকে প্রকাশ করতে রাজী নয়। দুজনেই যখন কথাবার্তায় মজগুল তখন ঠেজে বন্দী অক্ষয় সাজাহান সাজাহানার হাত ধরে বিলাপ করছেন।

শরৎনাথ বলে—আর ভায়া, সে জুং বাজারের নেই। নতুন ধান সাড়ে তিনটাকা মণ। আলমপুর পরগণা ভোর পাটের দাদন ছড়িয়েচি, দুশো মণ পাট এগনো মজুত হয়নি। ব্যবসার দিন চলে গিয়েচে। কার্তিক মজুমদার বলেন—আরে দাদা, তোমরা হলে হাতী। গেলেও দু-পাঁচ হাজার, মরবে না। আর আমরা হচ্ছি মণা, সামান্ততেই কষ্ট পাবো। তারপর—

মৌলু বলচে—বাবা, ওই ণাখো আওরংজেব—বাবা, ভারতবর্ষের ইতিহাসে আছে আওরংজেবের কথা—সেই আওরংজেব—

—আঃ, তুমি খোকা বোকো না।

শরৎনাথকে কার্তিক সব কথা খুলে বলেন নি। ব্যবসার গুপ্ত কথা কেউ বলেনা।

পাঁচশো মণ পাট তিনি চিনিলা কাপাসডাকার আড়তে জমা করে রেখেছেন, গরুর গাড়ি অভাবে আনতে পারছেন না সদর আড়তে, এখান থেকে লরিতে বোঝাই দেবেন।

গরুর গাড়ির কি ব্যবস্থা করে থাকেন শরৎনাথ, এইটি কার্তিক মজুমদার জানবার উদ্দেশ্যে বার বার তিনি সেই কথাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে লাগলেন।

সাজাহান বলচেন—দেবো লাফ, দিই লাফ—

নীলুর চোখ বেয়ে জল পড়চে। সে কথার অর্থ যে সব বুঝে তা নয়, সাজাহানের কথা বলবার ভঙ্গিতে তার কান্না আসচে।

নীলু বল্লে—বুড়ো কি বলচে বাবা? লাফ দেবে কোথায়?

কার্ত্তিক মজুমদার জবাব দিলেন—আঃ চুপ করো। শোন কি বলচে। ছুঁমি করতে নেই।

ছুঁমি সে কি করলে, বুঝতে না পেরে নীলু চুপ করে বইল।

আরও ঘণ্টাখানেক কাটলো। শরৎনাথ পাঁচখানা গরুর গাড়ি কাল সকালে পাঠিয়ে দেবার অঙ্গীকার করেচে।

বল্লে—কত সকালে?

—এই সাতটার সময়।

—তোমার বাড়ি পাঠাবো, না আড়তে?

—সদর আড়তে।

—লরি জোগাড় আছে?

—সে জন্তে ভাবনা নেই। স্তবল লরি দেবে বলেচে—ইষ্টিশানে পৌছে দেবে মাল।

—ভাড়া মণকরা না টিপ পিছু?

—টিপ পিছু।

জহরৎউন্নিসা রাজসভায় আওরংজেবকে হত্যা করতে গিয়েছিল এইমাত্র। খুব একচোট হাততালি পড়তেই কার্ত্তিক মুখতুলে চেয়ে দেখলেন। সুলতান সোলেমানের সঙ্গে আওরংজেবের কথা কাটাকাটি হচ্ছে। কার্ত্তিক মজুমদার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কত রাত হয়েছে? এগারো?

আর তিনি থাকতে পারচেন না। কাল সকালে উঠে সদর আড়তে শরৎনাথের প্রেরিত পাঁচখানা গাড়ি বাদে আরও অন্তত পাঁচখানা গাড়ির জোগাড় রাখতে হবে।

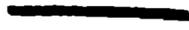
নৌলু বল্লে—না বাবা, আমি এখন উঠবো না—কেমন জায়গাটা হচ্ছে আর তুমি উঠচো এখন—

—চলো চলো। ওসব দেখবার অনেক সময় আছে। কাল রাত থাকতেই আমাকে উঠে মুচিপাডায় লোক পাঠাতে হবে গাড়ির জন্তে। তোমাদের কি? ভাবনা চিন্তে তো নেই, বাবা—নাও ওঠো—

নৌলু নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে কঁাদো কঁাদো মুখে বাবার সঙ্গে আসরের বাইরে এলো।

বাইরে এসে দাঁড়িয়েও সে সতৃষ্ণ ও সাগ্রহ দৃষ্টিতে পিছন ফিরে বার বার দূরের আলোকিত ষ্টেজটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো।

কার্ত্তিক মজুমদার বল্লে—হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে—হাঁ করে দেখচো কি পেছন ফিরে? সোখ দিয়ে চেয়ে পথ হাঁটো—অন্ধকার বাত্মির—



মাকাললতার কাহিনী

এই বর্ষার আমাদের গ্রামের নানা বনে ঝোপে মাকাললতার নিভৃত বিতান রচিত হয়েছে। আমি মাকাললতা বড় ভালবাসি। যেদিন প্রথম আমার চোখে পড়লো মাকাললতার বিচিত্র রচনা, তখন মন আনন্দে ভরে উঠলো।

তারপর সেই সুন্দর দিনটি এল, যেদিনে দেখলুম মাকাললতার ঝোপে ঝোপে কাঁচা সবুজ ফল ধরেছে। সবুজ, মসৃণ, চিক্কণ গা পুষ্ট ফলগুলির। আমি রোজ বেড়াতে যাই, নাইতে যাই, ঝোপে মাকালফলের শ্যামল রূপ দেখি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে।

ঘন বর্ষার দিনে নদীর তীরে, নিভৃত মৌন বনবিতানে নীল আকাশের তলায় ঝোপেঝোপে সবুজ আপেলের মত ফলগুলি, একদৃষ্ট কতক্ষণ ধরে চেয়ে থাকি। প্রজাপতি ওড়ে, পাখী গান গায়।

এ বছর বর্ষা তেমন হয়নি আজও, তবুও নদীর ধারে দুটি বনের ঝোপে মাকাললতা যথেষ্ট বেড়ে সারা ঝোপটির মাথা ঢেকে ফেলেছে। আর একটি মাকাললতার সুন্দর ঝোপ গজিয়ে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছে গোপালনগর বাজার ছাড়িয়ে পুরোনো ডাকঘরটায় সামনের বটতলায়।

ডাকঘরের এ ঝোপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মটরলতার মটরফলের গুচ্ছ ও মাকালফল পাশাপাশি ছলছে। মনে হবে পারস্য দেশের সূর্য্যতপ্ত কোনো উজানে আপেল ও ড্রাক্কাগুচ্ছ একসঙ্গে ফলেছে—বাংলাদেশের ঘরোয়া জঙ্গল এ নয়। তারপর হঠাৎ একদিন দেখি মাকাললতার ফুলগুলির কোনো কোনোটাতে রং ধরেছে। ক্রমে নেগুলোতে একটু করে রং চড়লো সূর্য্যতাপে, রাঙা টুকটুকে গোলা ফলের রং, ঘন সবুজ ঝোপের সবুজপত্রসম্মতার মধ্যে রূপসী নববধূর মুখের মত উঁকি মারছে রাঙা টুকটুকে সূঠাম সূগোল ফলগুলি। এই দুটি মাকালঝোপ আমার কাছে কি অপূর্ব্বই লাগে! নদীর ধারেরটি ও এই বটতলার।

• নদীতীরের ঝোপ সৃষ্টি হয়েছে এক নিবিড় লতাবিহানের নিভৃত ছায়াগহন আশ্রয়ে। একটা সাঁই বাবলা গাছের মাথায় মাকাললতা উঠে জড়িয়ে জড়িয়ে এটি ঝোপ তৈরী করেছে। সাঁই বাবলা গাছ এমন সুন্দর, যেখানে থাকে সেখানে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে না নেখে থাকা যায় না। সরু সরু লম্বা পাতা, তাঁকা বাঁকা শাখা প্রশাখা, ভাদ্রমাসে সাদা মঞ্জুরীর মত ফুল হয়েছে একসঙ্গে বহু, আর ওদের মুখ থাকে নীল আকাশের পানে উঁচু হয়ে। তারই ওপরে সেই মাকাললতার ঝোপ—অ'র মাথা থেকে ঝুলে ঝুলে পড়েছে এদিকে ওদিকে মাকাললতার দীর্ঘ ডালগুলি, আর তার প্রতি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, লতাগ্রভাগে, সবুজ পত্রাস্তরালে চিকণশ্যাম অথবা লাল টকটকে মাকাল ফল।

এর অদ্ভুত সৌন্দর্যের জন্তে পটভূমি বচনা করেছে পাশে বড় গোয়ালে লতার আর একটি বড় ঝোপ—একদিকে একটা আম্রবৃক্ষের নত শাখা, দশ বর্গফুট আন্দাজ সুনীল আকাশ আর গাছের তলায় শেওড়া, বৈঁচি, ভাট, বনকচু, বনআদা, সঙ্কামাণ্ডির নিবিড় জঙ্গল। প্রভাতের অপূর্ব বৌদ্ধ পরিস্ফুট হয়ে আসে বড় গোয়ালে লতার বড় বড় পানের মত পাতার মধ্যে দিয়ে, ওই পাতার উল্টো পিঠগুলো যেন স্বচ্ছ দেখতে সূর্য্যকিরণে, একটি সজল ছায়া বিস্তৃত হয়ে আছে বনতলে, মেঘনগরীর উর্দ্ধেব নীলাকাশ তার বাণী পাঠিয়েছে তার ওই দশ বর্গফুট বয়সের প্রতিনিধির হাতে, শালিক, ছাতাবে. ঘুঘু, দোয়েল, নীলকণ্ঠি, শ্যামা, তুর্গা, টুনটুনি প্রভৃতি পক্ষীকুলের সম্মিলিত প্রভাত-কাকলীতে মুখর হয়ে উঠেছে বনবাণী।

এরই মধ্যে সুদীর্ঘ নহমুখ লতা যেখানে মাটি ছুঁয়ে তুলছে, সেখানে লতার প্রতি গ্রন্থিতে তুলছে রাঙা টুকটুকে মাকালফল। ভাদ্রমাসে বেশির ভাগ মাকালফলই পেকেছে, কচিৎ ছ-চারটে কাঁচা আছে।

• এই মাকালঝোপ কি যাহু জানে। বোধ হয় কোন ঐন্দ্রজালিক লুকিয়ে থাকে ওর শ্যাম বনানীর অস্তরালে, মানুষের মনকে মোহগ্রস্ত করে ফেলে এক

মুহূর্তে—যে মুহূর্তে বনতলে ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ানো যায় সেই মুহূর্তেই। কোন অসাধারণ ঐন্দ্রজালিক আর তার ইন্দ্রজাল এ!

এই ক্ষুদ্র মাকাললতার ঝোপে আমার মন কেন মোহাবিষ্ট করে তার কারণ আমি জানিনে বলে কবিজনোচিত ধোঁয়াটে বর্ণনা দ্বারা জিনিসটাকে ঘোরালে, করা যেতো। কিন্তু এর কারণ আমি জানি।

কি জানি?

তাই কি বিশ্লেষণ করে বলার কথা?

ঝোপের পাশে দাঁড়ালুম সেদিন প্রভাত বেলায়। কাঁধে গামছা, হাতে সাবানের বাক্স, ইচ্ছামতীতে বনসীমতলার ঘাটে স্নান করতে যাচ্ছিলুম। ইচ্ছে করেই ঘুর পথ দিয়ে গেলাম শুধু এই মাকালফল-দোজানো ঝোপটি দেখবো বলেই।

রোজই দেখি। দেখবার সুযোগ একদিনও ছাডিনে। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার উর্দ্ধে একটি অকলুষ, উদার, দিব্য জগতের অকথিত বাণী এই মাকাললতাব ঝোপের পথে আমার মনে প্রবেশ করে। সারা নাস্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে এই অদ্ভুত সুন্দর রাঙা ফলগুলি! রং-এর কি তীক্ষ্ণ কনট্রাস্ট! চিকগাশাম লতাবীথির শ্যামল পত্রপুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে টুকটুকে রাঙা ফলগুলি... আপেল ফলের মত গড়ন অবিকল, তবে পাকা আপেল হয় হলদে-লালে মেশানো—এর একেবারে সি দূরের মত রং।

এর মধ্যেই বিশ্ব। এই মাকালঝোপের নিচেই। এই যে মাকাললতাগুলো এদিক ওদিক অদ্ভুতভাবে বুলচে গাছ থেকে পড়ে, তার গাঁটে গাঁটে পাকা ফল, এই যে রহস্যময় সুন্দর দৃশ্য যার দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না, অবাক হয়ে বিমুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে হয়—এই সৃষ্টির আইডিয়াক্রুপী বীজ কার মধ্যে ছিল? কোন্ দেবতা তিনি? কত বড শিল্পী তিনি?

“কল্পনাসৃষ্টিবীজঃ”

কার মহতী কল্পনার মধ্যে এ সুন্দর মাকাললতার ছলুনি, এর শ্রামপত্রগুচ্ছ, এর টুকটুকে রাঙা, সুগোল, সুঠাম ফলগুলো ছিল বীজরূপে অধিষ্ঠিত? বাষ্পাগ্নি-প্রোজ্জ্বল শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ কোটি নীহারিকা যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই মহাকল্পের ভয়াল রূপ কোথায় মহাশূণ্ডের দূর প্রান্তে; আর কোথায় এই ক্ষুদ্র পৃথিবীগ্রহের এক কোণে স্থনিভূত নির্জন লতাবিতান, সূর্যের সে বিরীট বাষ্পতেজ বহুমাইল ব্যাপী বায়ুমণ্ডলেব মধ্য দিয়ে সজল বর্ষার ছাওয়ার মধ্য দিয়ে, বসন্ত-দিনের জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে, বনবিহঙ্গকাকলীর মধ্য দিয়ে, বনকুসুমের সুবাসের মধ্য দিয়ে পরিস্কৃত হয়ে মোলায়েম হবে প্রভাতেব রৌদ্ররূপে যে লতাবিতানকে আলো করেছে,—আব তারই মধ্যে এই সুন্দর চিকণ, সুপুষ্ট, বাঁধা মাকালফল লতাগ্রভাগে দোতুল্যমান!

যিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে ..

যিনি মহাকল্প, তিনিই চিরপ্রাচীন অথচ চিবতরুণ পুষ্পবন্য দেবতা . . . সৃষ্টি বজায় রাখতে কামদেবের আবির্ভাবের প্রয়োজনে হবতো। মুখে মুখে এক কবিতা রচনা করলুম সেই অজানা শিল্পী দেবতার উদ্দেশে.....

হেথা নীল আকাশেব তলে

প্রজাপতি ওড়ে ফুলে ঘূলে,

হেথা কোথা কত দূরে

‘ওমিক্রন্ সেটি’ ঘোরে

সঙ্গে তাব সুশুভ্র ব.মন *

কবিতা হিসেবে লোকে হাসবে হবতো। কিন্তু লোকেদেব জন্তে এ বচিত নয়—যাব উদ্দেশে সেই প্রভাতেব কনকহ্যতিমণ্ডিত বন-বীথিতলে এ কবিতা মুখে মুখে বচিত, তিনি কৃপা ও প্রশ্রবেব স্মিতহাস্তে দক্ষিণপাণি প্রসারিত কবে গ্রহণ করেছেন অক্ষয়ের সে স্তুতি। ওমিক্রন্ সেটির অগ্নিলীলার মধ্যে এই

* ওমিক্রন্ সেটির সহকারী নক্ষত্র, ইংরেজীতে ‘হোয়াইট ডোয়াফ’ শ্রেণীর।

গোল গোল রাঙা মাকালফলের স্বপ্ন লুকানো আছে। ওমিক্রন সেটির চারিপাশে ঘূর্ণ্যমান গ্রহরাজি যদি থাকে, যদি সেখানে অনন্তযৌবনা দেবকন্য়ারা সে দেশে বনবীথির অন্তরালে, সেখানকাব অজ্ঞাত বসন্তদিনে অলস শযনে শুয়ে দিনপাত করেন, কে জানে সেই বনবীথির মাঝে এমন মাকাললতা, এমন দোতুল্যমান ফলগুচ্ছ, ঘনসবুজ ঝোপেব অন্তরালে এমন টুকটুকে বাঙা ফল হয়তো আছে।

মাকাল ফলের আয়ুষ্কাল বেশী দিন নয়, একমাস দেড়মাস। সুপক অবস্থায়ও দিন-পনেরো গাছে দোলে, তারপর একদিন ঝরে পড়ে যায়। তাই বোজ ছুবেলা যেতাম মাকাল ঝোপেব তলায়—একমাস দেড়মাস ধবে কত কপে একে দেখেচি—এই লতাবিতানকে। প্রভাতের আলোতে, ঘনবর্ষাব মেঘমেহুব সন্ধ্যায়, নির্জন ভাদ্রহিপ্রহবে নিশ্চর প্রশান্তিব মধ্যে উদার নীলাকাশেব তলে, ঘুঘুডাকা উদাস বনানীর পটভূমিতে, সুন্দর জ্যোৎস্ন'বাতের প্রথম প্রহবের জ্যোৎস্নায়। বাবলাব হলুদে ফুল আর সাঁইবাবলার ফুলেব শিশু, তাব মধ্যে ছুলে ছুলে হলুদেডানা শাদাডানা প্রজাপতিব মেলা, তার মধ্যে দোতুল্যমান মাকাললতাব নিবিড় ছায়াগহন আশ্রয়, তপোবনেব গায় স্নিগ্ধ, পবিত্র। খানিকটা সেখানে দাঁড়ালেই সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়ি, কেমন মেন সারাদেহ শিউবে ওঠে, মন অপূর্ব ভাবে ও স্বপ্নে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে—এ আমি এই গত এক মাসেব মধ্যে অন্তত চ' সাতদিন দেখেচি। সে স্বপ্ন বিসেব কি ববে বলবো, আশ্রশাখা ও সাঁইবাবলার ফুলে ভরা শাখার পিছনকার নীল আকাশেব স্বপ্ন, কোনো মহাশিল্পী মহাদেবতার প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের স্বপ্ন, সবুজ ঝোপের মাথায় ফলস্তু বাঙা মাকাল-ফলগুলির স্বপ্ন—গভীর সৌন্দর্যের স্বপ্ন। পাগল কবে দেব ওই স্বপ্ন।

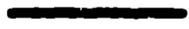
আমি জানি, তেমন ভাব ও স্বপ্নালুতা সারা বছরে একদিন এলেও জীবন ধৃত হয়ে যায়—তাই এই মাকাললতার সীজন্—এ এল মাসে সাতদিন।

এ মাকাললতার ঝোপ ঘেন পবিত্র দেবায়তন, অতি পবিত্র অতি সুন্দর।

সৌন্দর্যের পূজাবী যে, এই দেবায়তনে দেবতার আবির্ভাব সে দর্শন করবে।
এখানে জাগ্রত ও প্রত্যক্ষ দেবতাকে নিত্য প্রণাম কর।

ভয় হোক মাকালফলের! জয় হোক ওর্মক্রন স্টিব। কত বড ও কত
ছোট। কিন্তু উভয়ের মধ্যেই আর্টিস্টের আবির্ভাব অতি প্রত্যক্ষ, অতি বিচিত্র।
যাব মন খারাপ হবেচে সে অমৃতের সাগবে এসে তীর্থজল আহরণ করুক।
প্রত্যক্ষ করুক ঋগেদের শিবকুদ্রীয় স্তোত্রের অমর বাণী। বৃক্ষের পত্রের তুমি,
পত্রের পতনেও তুমি।

আশ্বিন মাসেব মাঝামাঝি মাকালফল ঝরে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে মাকাল-
লতার শ্যাম শোভা অন্তর্হিত হবে, বনভূমি আগামী বৎসরের শ্রাবণদিনের
প্রতীক্ষায় থাকবে—সুপক্ক মাকালফলের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায়। ঝরঝর বাদল
দিনের অপবাহ্নে আবার এদেব দল আসবে ঘুবে, যেমন এরা আসে প্রতি বর্ষা-
ঋতুতে, কত বৎসর, কত শতাব্দী, কত যুগ ধরে...অনন্তের সসীম প্রতিনিধিব
মতো। কেউ খবর রাখে, কেউ বাগে না।



বংশসতিকার সন্ধানে

সন্ধ্যার কিছু আগে নীরেন ট্রেন হইতে নামিল। তাহার জানা ছিল না এমন একটা ছোট্ট স্টেশন তাদের দেশের। কখনো সে বাংলা দেশে আসে নাই ইতিপূর্বে এক কলিকাতা ছাড়া।

নীরেনের দাদামশাই রায় বাহাদুর শামাচরণ গাঙ্গুলী তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন বাংলাদেশের পরীগ্রামে গিয়া সে যেন জল না ফুটাইয়া খায় না, মশারি ছাড়া শোয় না, নদীর জলে না স্নান করিয়া তোলা জলে স্নান করে। নীরেনের স্বাস্থ্যটি বেশ চমৎকার, ডাষেল মুগুর ভাজিয়া শরীরটাকে সে শক্ত করিয়া তুলিয়াছে, বড়লোকের দৌহিত্র, অভাব অনটন কাহাকে বলে জানেনা। মনে নীরেনের বিপুল উৎসাহ। চোখের স্বপ্ন এখনও কাঁচা, সবুজ।

একটা লোক প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে দাঁড়াইয়া প্ল্যাটফর্মে সাজানো দুর্ঝাঘাসের ওপর গরু ছাড়িয়া দিয়া গরুর দড়ি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। নীরেনের আহ্বানে সে নিকটে আসিল। . নীরেন বলিল—বামচন্দ্রপুর কতদূর জানো?

লোকটা বলিল—কেন জানবো না? মেটির বামচন্দ্রপুর তো? এখন খে
ঝাড়া তিনকোশ পথ—

—তিন কোশ?

—হাঁ বাবু। কনে যাবেন সেখানে?

—বাঁড়ুঘে বাড়ী।

—তা যান বাবু এই পথ দিবে—

নীরেনের কাছে এ সব একেবারেই নতুন। এই আদর সন্ধ্যার মাঠের মধ্যের পথ দিয়া সে যাইবে তিনকোশ দূরের গ্রামটিতে। ওই মাঠের মধ্যে কত মাটির ঘরে ভর্তি পাভাগাঁর পাশ কাটাইয়া তাহাকে যাইতে হইবে। মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়স যার ছুনিয়া তার পায়ে তলায়, সে অষ্টেলিয়ার মরুভূমিতে স্বর্ণখনির

সন্ধানে বাহির হইতে পারে, সে উত্তরমেরু-অভিযানে একঘণ্টার নোটিশে যোগ দিতে পারে, মাত্র একটা ছোট স্কটকেসের মধ্যে টুথব্রাশ আর তোয়ালে পুরিয়া।

চৈত্র মাস। স্টেশনেব পেছনে মাঠের ধারে বড় একটা নিম গাছ। কুটস্ত নিমফুলের ভুরভুরে সুবাস বাতাসে। নিমগাছ অবশ্য তাদের আলিগড়েও আছে, কিন্তু এমন রহস্যময়ী অজানা সন্ধ্যা মাঠের প্রান্তে তাহার জীবনে ক'টা নাযিয়াছে ?

নীরেন জানে, যদিও সে দিল্লী ও আলিগড়ে মানুষ, একবার কাণপুরে আসিয়া ভাবিয়াছিল প্রায় বাংলাদেশের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে বুঝি। পাঞ্জাবের অসম জলহাওয়ায় তাব শরীর গড়িয়া উঠিয়াছে—হর ভাষণ শীত, নয়তো দুর্দান্ত গরম—একশো বত্রিশ ডগ্রী উত্তাপের হাওয়া গা হাত পা পুড়াইয়া বহিতেছে—সেখানে গ্রীষ্মের ছপুবে বাসিয়া বসিয়া বাদশাহী তয়খানা ও সুলতানী ইরাণীদের স্বপ্ন লু'র আগুনে ঝলসাইয়া যার।

নীরেন মাঠের মাঝখানের পথ বাহিয়া হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া চলিল। দূর মাঠের প্রান্তে চাঁদ উঠিতেছে—নিশ্চয় আজ পূর্ণিমা, নতুবা সন্ধ্যার পরে চাঁদ উঠিবে কেন ? দুখানা গ্রাম পথে পড়ে.....রাস্তার ধারে দাড়াইয়া গ্রাম্য লোকেরা দেখিতেছে। একজন বলিল—কনে যাবা ?

—বামচন্দ্রপুর।

—বাড়ী কনে ?

—কলকাতা।

কলিকাতা বলাই সহজ, কারণ আলিগড় বলিলে ইহারা কিছুই বুঝিবে না। কিছুদূর গিয়া আর একটি ক্ষুদ্র পল্লা—নীরেন্দ্র নাম জিজ্ঞাসা করিল। রাস্তার ধারেই একটা পুরনো কোঠাবাড়ী, গোটা দুই নারিকেলগাছ, দুটি বড় ধানের গোলা নারিকেল গাছটির তলায়। জন পাঁচ ছয় লোক গোলার কাছে উঠানে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে কথাবার্তা বলিতেছে—নীরনকে দেখিয়া বলিল—বাড়ী কোথায় ?

—কলকাতায় ।

—ইদিকি কোথায় যাওয়া হবে ?

—রামচন্দ্রপুর ।

তাহারা পরস্পর চাওয়াচাষি করিয়া বলিল—এই রাত্রিরি সেখানে যাতি পারবেন না ।

নীরেন বলিল—কেন ?

—তিনকোশ পথ এখান থেকে, তা ছাড়া গরম কাল, মাঠের পথ, সাপ খোপের ভয় । কার বাড়ী যাবা রামচন্দ্রপুর ?

—বাঁড়ুয্যে বাড়ী ।

—কোন বাঁড়ুয্যে-বাড়ী ? সে গাঁয়ে ব্রাহ্মণ তো নেই ?

—এক বুড়ী আছে না ?

—আছেন বটে এক মা ঠাকরোন । ওই বাঁওড়ের ধারে গোলাবাড়ীতে থাকেন । তা তিনি আবার মাঝে মাঝে তাঁর জামাইয়ের বাড়ী যান কিনা ? দেখুন, আছেন কিনা ।

সেখানে পৌঁছাইতে নীরেনের বড্ড রাত হইয়া গেল । গ্রামটিতে চারিধারে বাঁশবন আমবনের নিবিড় ছায়া, প্রথমেই গোরালাদের পাড়া, তারপর বড মাঠ একটা, গোটা দুই বড় পুকুর, শেওলায় ও কচুড়ীপানায় ভর্তি ।

পথের ধারে একটা খড়ের ঘরে তখনও টিম্ টিম্ করিয়া আলো জ্বলিতেছিল । নীরেনের প্রশ্নের উত্তরে একটি লোক উত্তর দিল, সেই গ্রামই রামচন্দ্রপুর বটে । বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর বুড়ী ? হাঁ, আর একটু আগে বাঁওড়ের ধারে সারি সারি নারিকেল গাছওয়াল বড় আটচালা খড়ের ঘর ।

নীরেন বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিল । বড় একখানা আটচালা ঘরের পাশে ছোট রান্নাঘর, সেখানে আলো জ্বলিতেছিল ।

নীরেন উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল—বাড়ীতে কে আছেন ?

একটি বৃদ্ধা টেমি হাতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—কে ডাকে ?

—আমি ।

—কে বাবা তুমি ?

—আমাকে কি চিনতে পাবেন ? আমি আলিগড় থেকে আসছি ।

বুড়ী টেমিটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধবিয়া নীবেনের মুখ দেখিবাব চেষ্টা করিল । তাহার মুখে কৌতূহল ও সন্দ্বিগ্নতার বেখা । হাতের তালু চোখের উপর আড় কবিয়া ধবিয়া আলো হইতে চোখ বাঁচাইবার ভঙ্গি করিয়া আরও দু এক পা আগাইয়া আসিয়া বলিল—কে বাবা ?

—আমার বাবার নাম ৩বাজকৃষ্ণ মুখুয্যে—

বুড়ী আপন মনে বিড বিড করিয়া বলিল—বাজকেষ্ট ? বাজকেষ্ট ?

—আমাদের পৈতৃক বাড়ী ছিল গড় মুকুন্দপুর—আমার ঠাকুরদাদার নাম ৩তারিণীচরণ মুখুয্যে—আমাব মায়ের বাপের বাড়ি ছিল সামতাবেড়ে, মায়ের নাম ছিল অমিয়বালী—

—ও ! এখন বুঝলাম । তুমি আমার মেয়েই মইবেই হলে !

—হাঁ দিদিমা ।

—এসো এসো ভাই ! কত কালের কথা সব । তোমাদের মুখ দেখে মরবো এইটুকু বোধ হয় ছিল অদেষ্টে । আর সবাই ছেড়ে গিয়েছে বাবা, শুধু আমিই পড়ে আছি !

—সই-মা কোথায় ?

—সে তো আজকাল এখানে থাকে না । দে থাকে তাব শশুরবাড়ী, এই পাশের গা ।

—আমি তাঁব সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি ।

—আজ রাত্তিরে এখানে থাকো । কাল যেও এখন সকালে । এখন থেকে দু কোশ ।

— এই যে বল্লেন পাশের গাঁ ?

— মধ্যে মাদারহাটির মাঠ আর জলা পড়ে যে ভাই । ছুকোশের বেশি ছাড়া কম হবে না ।

নীরেন হাত পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিল । এ যেন নতুন একটা জগতে সে আসিয়া পড়িয়াছে । এমন দেশে সে কখনো আসে নাই । যে দেশে তাহার জন্ম, সে দেশে এত বনজঙ্গল কেহ কল্পনা করিতে পারে না গ্রামের মধ্যে । নতুন ধরণের গাছপালা, অসংখ্য পাখীর কলকাকলী, বনফুলের মৃদু সৌরভ । বুড়ীর রান্না শেষ হইতে রাত দশটা বাজিল । কেবল সোঁদা সোঁদা মাটির গন্ধ বাহির-হওয়া লেপাপোঁছা মাটির ঘরের দাওয়ায় কলার পাতা পাতিয়া বুড়ী তাহাকে খাইতে দিল । রাঙা আউশ চালের ভাত, পেঁপের ডালন, সোনা মুগের ডাল, উচ্ছে ভাজা, আলুভাত, ঘন আঙটানো সরপড়া তুখ, দুটি পাকা কলা, একদলা আখের গুড়ের পাটালি । অদ্ভুত রান্না বুড়ীর হাতের । আলিগড়ের পশ্চিমা পাটকের হাতের রান্না খাইয়া সে আজীবন অভ্যস্ত—এমন চমৎকার রান্নার সঙ্গে পরিচয় ছিল না !

উচ্ছ্বসিত প্রশংসার স্ববে বলিল—এমন রান্না কখনো খাইনি দিদিমা ! শুনতাম বটে বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ের রান্নার কথা—কিন্তু এ যে এমন চমৎকার তা ভাবিনি—

বুড়ী হাসিয়া বলিল—রান্না করতে পাবতেন আমার শাশুড়ী । তাঁর কাছেই সব শেখা । ডাকসাইটে রান্নাধুনি ছিলেন আটখানা গাঁয়ের মধ্য—

বুড়ীর কথার মধ্যে যশোর জেলার টান নীরেনের বড ভাল লাগিল ।

শুইয়া শুইয়া উঠানের নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর পাহার কম্পন দেখিতে দেখিতে নীরেন ভাবিতেছিল, এই তাহার স্বদেশ, তাহার অতি প্রিয় স্বদেশ । এই তাহার মায়ের জন্মভূমি, পিতার জন্মভূমি, পূর্বপুরুষদের জন্মভূমি—বাংলা দেশ । কেন এতকাল সে মাতৃভূমিকে ভুলিয়া ছিল ? ভাগ্যের দোষ । সে কি জানিত এত

সৌন্দর্য্য বাংলাদেশের রাত্রির অন্ধকারে ? গন্ধভরা অন্ধকারে ? পাখীর ডাকের মধুর তান সে হিমালয়ে শুনিয়াছে । আলমোডায় ল্যান্সডাউনে শুনিয়াছে । তাহার ধনী মাতামহের সঙ্গে কয়েকবার সে সব স্থানে সে গিয়াছিল । দেবতাস্থা নগাধিরাজ মাথায় থাকুন—মাথায় থাকুক ‘ক্যামেলস্ ব্যাক’-এর অপূর্ক দৃশ্য, মুসৌরীর অতুলনীয় গিরিশোভা—এখানকার পক্ষাকুলের স্মৃষ্টি কাকলী যেন বহুপরিচিত বিগত দিনের প্রিয়জনের বার্তা বহন করিয়া আনে, কত দিনের ঘরোয়া কাহিনী এদের সঙ্গে জড়ানো ।

বুড়ী বলিল—ঘুম হচ্ছে না ভাল গরমে বুঝি ? পাখা নেবা একখানা ?

—না দিদিমা । নতুন জায়গা বলে ঘুম আসচে না, গরমে নয় ।

—এবার ঘুমিয়ে পড়ো ভাই—

—হাঁ দিদিমা— ?

—কি ভাই ?

—আমার বাবাকে আপনি দেখেছিলেন ?

—না ভাই, আমার কোথাও যাতায়াত ছিল না । শুনিচি তাঁর কথা, দেখিনি কখনো—তোমাদের গাঁ ছিল তো—

—গড় মুকুন্দপুর ।

—নাম শুনিচি, তবে যাইনি সেখানে ।

সকালে উঠিয়া বুড়ী বলিল—হ্যাঁ ভাই, তোমরা সহরের লোক, সকালে কি খাও ?

নীরেন হাসিয়া বলিল—যা খাই, তা কি দিতে পারবেন দিদিমা ? চা ?

বুড়ী বলিল—ও আমার পোড়া কপাল । ও সব যে কখনো খাইনি ভাই, ও সবেল পাটও নেই । একটু বেলেব সরবৎ করে দি । ডোবার ধারের বেলাগাছটায় কাল দুটো পাকা বেলা পেইছিলাম ভাই ।

চায়ের বদলে বেলেব সরবৎ । উপায় কি ? খাইতেই হইল তাহাকে ।
বুড়ী বলিল—তুমি কি মনে ক’রে এসেছিলে ভাই ?

সেই কথাটা বলাই নীরেনের পক্ষে শক্ত। সে যে জগৎ আসিয়াছে প্রিয় পৈতৃক পল্লীগামটিতে, বুঝা কি সে কথা বুঝিতে পারিবে? সে বলিল—বেড়াতে এলাম দিদিমা।

—এর আগে কখনো আসনি?

—না দিদিমা।

ছপুরের আগেই তাহার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল এখান হইতে, কিন্তু বুড়ী ছাড়িল না। ছপুরের পরে রোদ অত্যন্ত চড়িল। বেলা চারটার আগে বাহির হওয়া সম্ভব হইল না। যাবার সময় বুড়ী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিল—এসো, এসো, ভাই, তোমার সইমার সঙ্গে দেখাশুনো করে আবার এখানে আসবে কিন্তু। ভুলে যেও না ভাই। আচ্ছা ভাই।

আধ ঘণ্টার মধ্যে নীরেন আসিয়া মাদারহাটের মাঠ ও জলার মধ্যে পড়িল। প্রকাণ্ড বিল, পদ্মফুল ফুটিয়া থৈ থৈ করিতেছে, পদ্মের পাতার ভিড়ে জল দেখা যায় না, একদিকে একটি অস্তরীপ মতন স্থানে অনেকগুলি বড় বড় গাছ—নীরেনের ইচ্ছা হইল ওই গাছগুলির তলায় সে কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করে। এই সুন্দর জলাভূমি যেন কাশ্মীরের ডাল বা উলার হৃদের মত শোভাময়, কিন্তু এসব স্থানে টুরিস্ট ব্যবসায়ীদের ঢাক পিটানোর শব্দ নাই, সুতরাং এমন সুন্দর একটি সৌন্দর্য্যময় স্থানে কখনো কেহ আসেনা।

সইমাদের গ্রামটিতে জঙ্গল তত নাই—ব্রাহ্মণপাড়ায় অনেকগুলি কোঠাবাড়ী, প্রায়ই সব চাষী গৃহস্থ, বড় বড় গোলা উঠানে, গোয়ালবাড়ী ভর্তি গরু। একজনের উঠানে দোতলা বাড়ী তৈয়ারি হইতেছে, উঠানের বাতাবী লেবু গাছের তলায় মজুরেরা দুমদাম শব্দে সুবকি ভাঙিতেছে। নীরেন সেখানে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—চক্ৰিত্বদের বাড়ী যাব কোন্ দিকে?

একজন বলিল—কোন্ চক্ৰিত্ব? অনেক চক্ৰিত্ব আছে এ গাঁয়ে।

—ভুবনমোহন চক্ৰিত্ব—

—সে ও পাড়ায় । ওই তেঁতুল গাছের পাশের রাস্তা দিয়ে যান—

আধঘণ্টা পরে সে সইমাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার প্রদত্ত পিড়িতে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিল । নীরেন দেখিল তাহার সইমার বয়স খুব বেশি নয়, মাথার চুল এখনও একগাছি পাকে নাই, রং বেশ ফর্সা, দোহারা চেহারা, এক সময়ে যে ইনি সুন্দরী ছিলেন, এখনও দেখিলে বোঝা যায় ।

সইমা সোথের জল ফেলিলেন । অনেক আশীর্বাদ করিলেন । পাকা বেলের সরবৎ, মুগের ডাল ভিজানো ও আখের গুড় খাইতে দিলেন । সইমাকে পাইয়া নীরেন যেন হারানো মায়ের সান্নিধ্য বহুদিন পরে অনুভব করিল । সে সইমাকে কখনো দেখে নাই এর আগে । সইমা কিন্তু তাহাকে দেখিয়াছিলেন সে যখন দুই বৎসরের খোকা, তখন । প্রোটা মহিলার বহু পুরানো দিনের শোকস্মৃতি উথলাইয়া উঠিল আজ তাহাকে পাইয়া । এমন কত লোকের নাম করিতে লাগিলেন যাহাদের কথা মায়ের মুখে আলিগড়ে নীরেন শুনিত বাল্যকালে—কত বাল্যস্মৃতিজাগানো নামাবলী । দেশেব ঘবের সব লোকের নাম । বাঁচিয়া আছে কেউ কেউ এখনও—তবে বেশির ভাগই মাঝা গিয়াছে ।

সইমা বলিলেন—তোমার মুখে সইয়ের মুখ যেন মাখানো রয়েছে —

নীরেন হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল ।

—সই বড় সুন্দরী ছিল । গ্রামের কাজকর্মে যখন সেজেগুজে নেমতন্ন খেতে কি বিয়ে খাওয়ায় জল সইতে যেতো তখন লোকে ছু দণ্ড চেয়ে দেখতো । এদানি রোগে শোকে আর কিছু ছিলনা চেহারার । এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে আর কখনো দেখা হয় নি সইয়ের সঙ্গে । সে কতদিন হবে রে নীরু ?

নীরেন মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল—তা প্রায় তেইশ চব্বিশ বছর হোল ।

—সই মারা গিয়েছে কতদিন ?

—বেশি দিন না, বল্লাম যে পছর পাঁচেক হবে ।

—তাহোলে সই বেঁচে থাকলে এই পর্যন্তাল্লিগ বছর বয়েস হোত—

—তা হবে, আমারও হোল ছাব্বিশ। আপনার ছেলেও তো আমার বয়সী হবে, না সইমা ?

সইমা আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন—কোথার ছেলে বাবা ? সে ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েচে অনেক কাল।

রাত্রে নীরেন খাইতে বসিয়াছে, সইমা সামনে বসিয়া খাওয়ার তদারক করিতেছেন।

নীরেন বলিল—আপনার আর দাঁদমার রান্না সমান। এমন রান্না অনেকদিন খাইনি।

সইমা বলিলেন—তোমার মাও ভাল রাঁধতো রে—যখন কপাল পুড়লো, এ দেশ থেকে সেই পশ্চিমে চলে গেল, তখন সে কি কান্না ! বলে—সই, আর কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে ? এই যাওয়াই আমার শেষ বাণী। সে ভাগিয়মানী স্বর্গগে চলে গেল, আমিই রইলাম পড়ে।

নীরেন হাসিয়া বলিল—আপনি না থাকলে আজ কার মুখ চেয়ে এখানে আসতাম বলুন সইমা ? সইমা ছুধের বাটি নীরেনের সামনে রাখিয়া পাথার বাতাস দিয়া দুধ জুড়াইতে জুড়াইতে বলিলেন—তোকে যত্ন করবার দিন যখন আমার ছিল, তখন এলিনে। এখন কি আছে সইমার, কি দিয়েই বা তোকে যত্ন করবো ? হাঁয়ারে এতদিন পরে কি মনে কবে এলি ঠিক বল তো ?

—বলি সইমা, আপনি বুঝতে পারবেন। জানেন, আমি ছুবছর বয়সে বাংলা দেশ ছেড়ে গিয়েছিলাম ?

—সে তো খুব জানি।

—আর কখনো এদেশে আসিনি এর মধ্যে ?

—তাও জানি।

—এতকাল পরে মায়ের ও বাবার বাক্সের কতগুলো পুরনো চিঠি পড়লাম

সেদিন। পড়ে মনটা বড় ব্যাকুল হল জন্মভূমি দেখবার জন্মে। সে সব চিঠিতে আপনার নাম আছে, আমার এক পিসিমার নাম আছে। আমি বাবাকে কখনো দেখিনি, তাঁর সন্ধকে, আমার ঠাকুরদার সন্ধকে—আরও অনেক নাম আছে বাবার এক পুর্বানো খাতার মধ্যে—সকলের সন্ধকে আমাব জানবার বড় ইচ্ছে হোল। আমি জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত মামার বাড়ীর সকলকে দেখে আসচি, বাপের বাড়ীর বা নিজের বংশের কিছু খবর রাখি নে। সেই সব খুঁজে পেতে বার করবো বলেই এলাম।

—ওমা আমার কি হবে! কোথাকার পাগল ছেলে ছাখো—

—না সই মা, আপনি ভেবে দেখুন আমার মনের অবস্থা। আমার ছাব্বিশ বছর বয়স হয়েছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমাদের বংশের কোনো খবর রাখি নে। বাপের বাড়ীর কোন লোকের কথা জানি নে। অথচ আমার ভয়ানক ইচ্ছে জানবার। আপনি হয়তো ভাববেন এ আবার কি, আমাব কিন্তু সইমা ঘুম হয় না এই সব ভেবে—সত্যি বলচি—আপনি আমার বলে দিন কি ভাবে আমি তা করতে পারি—আমি তো কাউকে চিনি নে—বাংলাদেশের ছেলে, কিন্তু কোনো খবর রাখি নে দেশের।

—সব বলে দেবো, এখন খেয়ে শুয়ে পড়ো দিকি ছুঁ ছেলে আমাব!

নীরেন হাসিল। অনেকদিন পবে যেন হারানো মাকে ফিরিয়া পাইয়াছে, সেই ধরনের হাসি সইমাব মুখে। ভাগ্যিস সে আসিয়াছিল। শ্যামল বাংলা মা যেন সইমার মূর্তিতে তাহাকে স্নেহ অভ্যর্থনা জানাইতেছেন।

চৈত্র মাসের বাত্রি। হু হু দক্ষিণ হাওয়া খোলা জানালা দিয়া বহিতেছে। কি একটা ফুলের তীব্র সুবাস বাতাসে। নীরেন বাংলাদেশের অনেক কিছু গাছপালা চিনে না—কিন্তু তাহার কি ভাল লাগে এই সব পল্লীগামের আগাছা জঙ্গল! আজ দুদিন তিন দিন মাত্র ইহাদের সহিত পরিচয়—তবুও যেন মনে হয়

কত দিনের নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় তাহার শিরা-উপশিরার রক্তের সহিত আবদ্ধ ইহাদের প্রাণস্পন্দন। এই সব বনস্পতির সহিত সেও একদিন এই তাহার প্রিয় জন্মভূমির মাটিতে জন্মিয়াছে।

সে একখানা খাতা আনিয়াছে সঙ্গে।

খাতাখানা তাহার পিতামহ ৩গদাধর মুখোপাধ্যায়ের স্বহস্ত-লিখিত। তাহাদের গ্রামের কত প্রাচীনদিগের তুচ্ছ গ্রাম্য ঘটনা ইহাতে কেন যে তাহাব পিতামহ টুকিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিই বলিতে পারিতেন। ক্ষুদ্র এক অখ্যাত পল্লীগ্রামের প্রাচীন ইতিহাসে কার কি ফল? অমন কত গ্রাম, কত অগুন্তি গ্রাম বাংলা দেশে। কে জানিতে চাহিতেছে তাহাদের ইতিহাস? গরজই বা কাহার?

আজ রাত্রে আলোর সামনে বসিয়া খাতাখানা সে খুলিয়া দেখিল। সেইমা তাহার বিছানা নির্দেশ করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ঘরে সে একা। মাটির ঘর। ছোট জানালা, কাঠের গরাদে। জানালার বাহিরে একটা কি গাছে থোকা থোকা গাদা গাদা ফুল ঝুলিতেছে—কতক ফাটিয়া তাহাদের ভিতরকার ঝাঙা ঝাঙা বীচি বাহির হইয়াছে—দিনমানে নীরেন লক্ষ্য করিয়াছিল।

খাতার পাতায় লেখা আছে—

“২২শে চৈত্র। ১২৭২ সাল.....”

এইটুকু পড়িয়াই নীবেন অবাক হইয়া যায়। কত কালের কথা! ১২৭২ সালেও পৃথিবী এমনি সুন্দর ছিল, এমনি বসন্ত নামিত এ পাড়ারগায়ের বনবুকে, এমনি কোকিল ডাকিত রাত্রি দিনে? সে তখন ছিল কোথায়? কোন্ অতীত দিনের কাহিনী এ সব?

মনে পড়ে আলিগড়ে তাদের দোতলার পড়ার ঘরে বসিয়া এই ডায়েরির পুরাতন তারিখগুলো সে পড়িয়া বিস্মিত হইত—কিন্তু তাহার চেয়েও অনেক বেশি বিস্ময় ও রহস্যের অনুভূতি আজ তাহার মনে।

তারপর লেখা আছে, ‘আজ রামলোচন রায়ের প্রথম পক্ষের স্ত্রী উহাদের আমবাগানে হারাধন মুস্তফির সহিত ধরা পড়িলেন। ইহা লইয়া আজ জ্যাঠা-মশায়দের চণ্ডীমণ্ডপে সারাদিন ড’মাদোল চলিতেছে। রামলোচনের স্ত্রী বলিষাছেন তিনি নিদ্রুষি। আমেব গুটি ঝড়ে পড়িতেছে, তাহাই কুড়াইতে গিয়াছিলেন, হারাধন মুস্তফির কথা কিছু জানেন না। আজ রামলোচন রায়ের স্ত্রীকে দেখিরাছি। বয়স হইলেও চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা কবে। খুব সুন্দরী। বুমোরের বৌ ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না।’—

নীরেন এই ডায়েরিটুকু পড়িয়া কতবার মনে মনে হাসিয়াছে।

পিতামহ গদাধর মুখুয্যে বহুকাল সাধনোচিত ধামেই সম্ভবত প্রস্থান করিয়াছেন, নীরেনের মায়ের বিবাহ তখনও হয় নাই। সে পিতামহের কার্যের সমালোচনা করিতেছে না, তবুও মনে হয় এই বৃন্তকাব বধূটির এইখানে উল্লেখ থাকার কারণ কি? বিশেষ করিয়া ঠাকুরদাদা ইহারই নাম করিলেন কেন? গ্রামের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলিয়া? না—

হায রে সে ১২৭২ সাল! আজ রামলোচন রায়ের নিরপরাধা সুন্দরী পত্নী যিনি নিৰ্জ্জন ছপুরে বাগানে আমের গুটি কুড়াইতে গিয়া হারাধন মুস্তফির সঙ্গে নিজের নাম যোগ করিবার সুযোগ দিয়া মিথ্যা কলঙ্ক কুড়াইয়াছিলেন একদিন প্রায় আশি বৎসর পূর্বের এক সুমধুব কোকিলমুখবিত, পুষ্পসুধাসামোদিত, প্রেমোচ্ছল বসন্তদিনে—কোথায় তিনি আর কোথায় তাঁহার রূপের প্রতিছন্দী সোনা বৃন্তকারের রূপসী বধু? আজ এই সব পল্লীগ্রামের মাটিতে তাঁহাদের নাম নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়াই যাইত যদি না তাহার পরোপকারী পিতামহ গদাধর মুখুয্যে এত ঘটনা করিয়া উক্ত বধূয়ের ইতিহাস তাঁহার ডায়েরিতে নিঃস্বার্থ ভাবে না লিখিয়া রাখিতেন!

• হাসি পাইবার কথাই তো।

নীরেন ডায়েরি বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল, কিন্তু আজ রাত্রে তাহার বংশের

পূর্বপুরুষেরা যেন ভিড় করিয়া আশেপাশে তাঁহাদের অদৃশ্য অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহাদের ইতিহাস ভাল করিয়া জানিবার জগ্ৰই তো সে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া বাংলাদেশে তাহার জন্মভূমি অঞ্চলে আসিয়াছে এত কাল পরে। তাঁহারা ঘুমাইতে দিবেন না।

সকালে সইমা ডাকিয়া ঘুম ভাঙাইলেন—ও নীরু, ওঠ বাবা, বেলা ঝাঁ ঝাঁ করচে—

নীরেন ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

সইমা বলিলেন—তোমার আবার চা খাওয়ার অভ্যেস আছে, না?

—ছিল তো সইমা।

—এখানে কি করি উপায় তাই ভাবচি—

—ভাবতে হবে না। এখানে না হোলেও চলবে।

—তা কি হয় বাবা? দেখি। যার যা অভ্যেস—

—না সইমা, কিছু চেষ্টা করতে হবে না। তা হলে আমি দুঃখিত হবো।

সইমা কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে এক পেয়ালী ধূমায়িত চা আনিয়া তাহার সামনে রাখিলেন এবং একটা বাটিতে একবাটি মুড়ি। রায়বাড়ী হইতে চা চাহিয়া আনিয়াছেন, সেখানে বাড়ীসুদ্ধ সবাই চা খায়।

নীরেন চা পাইয়া মনে মনে খুশি হইল। মুখে বলিল—কেন বলুন তো এ সব—পরের বাড়ী থেকে আনতে যাওয়া?

সইমা বলিলেন—তোমার মা থাকলে করতো না?

—তা কি জানি।

—করতো রে করতো। শুনবি তোমার মায়ের কথা?

—কি, বলুন।

—তোমার মা বড্ড শাস্ত ছিল।

—মাকে আমি দেখেছি, শাস্ত ছিলেন সবাই বলতো।

—একবার সই আর আমি নাইতে গিয়েচি ঘাটে। সাঁতার দিয়ে দুই সই মিলে নদীর মাঝখানে গিয়েচি। এমন সময় ঘাট থেকে কে চৌঁচিয়ে বললে নদীতে কুমীর এসেচে। আমরা তো তাড়াগাডি ঘাটের দিকে এগুচ্ছি, এমন সময় সইকে আমি ভয়ে জড়িয়ে ধরলাম। সই যত বলে ছাড়া ছাড়া দুজনেই ডুবে যাবো, আমি ততই ভয়ে সইকে জড়াই।

নীরেন রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল—তারপর ?

—তারপর আর কি ? দু জনেই বেঁচে উঠলাম, একখানা নৌকো আমাদের ওই অবস্থায় দেখতে পেয়ে ছুটে এল।

—তখন আপনারা একগ্রামেই থাকতেন ?

—হাঁবে, নইলে আর সই বলবো কি করে। পাগল ছেলে আর কি ! কথাটা নীরেন সন্ধ্যাবেলা তাহাব খাতার লিখিয়া রাখে।

গ্রাম্য জীবনের কোন কথা সে বাদ দিতে চায় না। মরুপর্বত ভেদ কবিয়া সূদূর পাঞ্জাব হইতে ছুটয়া আসা (কোন কটাক্ষ কেহ করিবেন না) তবে কিসের জন্ত ?

সইমার শশুরবাড়ী এটা। কিন্তু একটি দেওরপো ছাড়া এখানকার বাড়ীতে কেহ থাকে না। দুটি দেওর বাহিরে চাকুরী করে, সেখানেই পরিবার লইয়া থাকে ; যে দেওরপো এখানে আছে ওটি পিতৃমাতৃহীন অনাথ। জ্যাঠাইমার কাছে মানুষ হইতেছে। জ্যাঠাইমা ভালও বাসেন।

দেওরপোর নাম কানু। কানু নীরেনকে খুব ভাল চোখে দেখে নাই। এই দুর্শ্বল্যের বাজারে ইনি আবার কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন ! কেন রে বাবা। যে তিন বিশ ধান হইয়াছিল, ইনি এখানে আসিলেন,—তাহাতে ক'দিন যায ? জ্যাঠাইমাও দেখিতেছি নীরু বলিতে অজ্ঞান।

কানু আসিয়া বলিল—যাত্রা দেখতে যাবেন ?

—কি যাত্রা ?

—এই দিগি—গোনাই যাত্রা ?

—সে আবার কি ?

—দেখবেন এখন । দিন দিখি একটা টাকা চাঁদা । নীক একটা টাকা বাহির করিয়া কান্নুর হাতে দিল ।

গোনাই যাত্রার আসরে বসিয়া নীরেন যাত্রা তত দেখে নাই, যত সে এই সুন্দর রাত্রি ও যাত্রার আসরের পরিবেশের কথা চিন্তা করিয়াছে । যেখানে যাত্রার আসর, সেটা ছোট একটা মাঠ, তার চারিপাশে বনজঙ্গল, একদিকে বনের প্রান্তে একটা কামারের দোকান, সেখানে এখনও হাপরে আগুন জ্বলিতেছে । বাঁশের খুঁটিতে পাল টাঙানো হইয়াছে । পান বিড়ির দোকান বসিয়াছে, চাষা লোকে যাত্রা দেখিতে আসিয়া পানের দোকানের সামনে ভিড় করিতেছে । একটা মুচুকুন্দ চাঁপার গাছতলায় ফুল পড়িয়া বিছাইয়া আছে । বাতাসে মুচুকুন্দ চাঁপার সুবাস ।

একটি গ্রাম্য মেয়ে ছিল গোনাই বিবি । তারই সুখ দুঃখের কাহিনী । নীরেনের পক্ষে এমন বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু যারা শ্রোতার দল, তাদের সারারাত্রি জাগিয়া দেখিবার বস্তু । ভ্রাতার বিরহে কাতরা তরুণী গোনাই বিবির সে করুণ গান, ‘ও বহির, বহির রে, বৈঠা হাতে নিলি রে’ অনেকের চোখে জল আনিয়া দিল ।

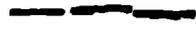
নীরেন ভাবিতেছিল বহুদূরের লিপুলেক গিরিবন্ধে বরফ গলিয়াছে । দলে দলে ঝক্কুর পিঠে বোঝাই দিয়া যাত্রীরা চলিয়াছে মানস সরোবর ও কৈলাসের পথে । গুরেলা মাক্কাতার তুষারাবৃত শৃঙ্গ সায়াহুদিনের সূর্য্যকিরণে সোনার রং ধরিয়াছে । তাহার দাদামহাশয়ের বন্ধু করালীচরণ মজুমদার সস্ত্রীক এই মাসের শেষে মানস সরোবরে রওনা হইবেন, সঙ্গে বাইবেন নীরেনের দিক্শিমা ও বড় মামীমা, বাড়ীর গোমস্তা নাহু চক্ৰতি । আলিগড় হইতে আলমোড়া ।

আলমোড়া হইতে ধারচূলা। ধারচূলা হইতে লিপুলেক পাস। লিপুলেক হইতে মানস সরোবর। সে নিশ্চয় যাইত ওখানে থাকিলে।

কিন্তু সেজন্তু তার দুঃখ নাই।

বাংলাদেশে সে আসিয়াছে মাতৃভূমির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সন্ধানে। গাছপালায় পাখীর কাকলীর মধ্যে দিয়া সে পরিচয় দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। ঐ মুচুকুন্দ চাঁপার ফুল যেন কতকাল পূর্বের কোন বিস্মৃত অতীত শৈশবদিনে তাহার অজ্ঞাতসারে একদা সৌভ বিতরণ করিয়াছিল—মাবেষ মুখেব সঙ্গে সে দিনটির ছন্দ একই তারে গাঁথা হইয়া আছে তার মনের বীণায়।

পরদিন গ্রাম্য নদীব ধারে একটা বড় নিমগাছেব তলায় সে দাঁড়াইয়া।



✓কর্মপিটিশন

শিবশঙ্কর সকালে উঠেই দু'দফা ফোন করলেন। একবার অ্যাটর্নি রায় ও মিত্রের জীবনধন রায়কে ও আর একবার প্রসন্নদাস বড়ালের অংশীদার ও কর্তা হরিদাস বড়ালকে ; কারণ ওদের আপিস এখনো খোলেনি।

—নমস্কার, কি খবর ?

—আসুন একবার। কতদূর করলেন ?

—আসবো এখন ?

—এখানেই চা খাবেন।

একটু পরে বাড়ীর বাইরে মোটরের শব্দ শোনা গেল এবং জীবনধন রায় ঘরে ঢুকলেন। জীবনধন রায়ের পরনে সাহেবি পোশাক, চোখে স্টীলের ফ্রেমের চশমা, পায়ে পেটেন্ট চামড়ার চকচকে বুট, বগলে ফোলিও ব্যাগ।

—আসুন, মিঃ রায়, বসুন। নমস্কার।

—নমস্কার।

—ওরে, চা নিয়ে আর। তারপর ?

—তৈরি। সরেজমিন তদারক করবেন না ?

—রেজেষ্ট্রী আপিস সার্চের রেজাল্ট কি ?

—ভালো। দাগী মাল নয়, তবে দেড়—দেড়ের কমে হবে না। আমাদের তিন পাসেন্ট।

শিবশঙ্কর বাবু হরিশ মুখুয্যের দ্বীটে তিনতলা বড় বাড়ী কিনছেন এঁদের দালালিতে। দেড় লক্ষ টাকা দাম, অ্যাটর্নিরা তিন পাসেন্ট কমিশন নেবেন

—আসল কথা হচ্ছে এই। রূপোর ট্রে ভরে টোস্ট, ডিম সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ ও লেটুস সেদ্ধ এল, তার সঙ্গে চায়ের লিকার, দুধ আলাদা, চিনি।

শিবশঙ্কর বাবু বললেন—মিষ্টি দিইনি—কারণ আমাদের এ বয়সে—

—না না। থাক। তারপর আমার গাড়ী রেডি, চলুন একবার সরেজমিনে।
জিনিসটা দেখুন।

—বেড রুম কতগুলো?

—উনিশটা রুম সবস্বদ্ধ ওপরে নিচে। ছ'টা বাথরুম, এ বানে বাইবে
তিনটে আলাদা পাইখানা। খুব ভালো বাড়ী। কুণ্ডু কোম্পানীকে রাজি
করতে বেগ পেতে হয়েছে খুব। বুডো একেবারে বেঁকে বসেছিল শেষকালে।

—এখন যেতে পারবো না—মাপ করুন। এখন বেলা দশটা পর্যন্ত মরবার
ফুর্সৎ নেই—এক্ষুনি আবার লোক আসবে—

—আচ্ছা উঠি তাহলে। ওবেলা আপিসে ফোন করবেন এখন—ওখান
থেকে যাওয়া যাবে।

একটু পরে হরিদাস বড়ালকে আবার ফোন করা হোল।

—নমস্কার, কি খবর? ইয়া, একবার করেছিলাম—ইয়া—এই আধ ঘণ্টা
আগে। ইয়া। সোনাটার কি হোল? বারের দাম কত বল্লেন? তিন
আনা? আমার চাই কিছু—ইয়া—ইয়া—ইয়া—আচ্ছা। আজ?...ইয়া—
আচ্ছা। আপিসে? আচ্ছা।

সাধারণ লোকে এ কথাবার্তা থেকে বিশেষ কিছু বুঝবে না, কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ
হাজার টাকার ওপর 'বড়াল বার' নামক বিখ্যাত স্বর্ণের বাট কিনবার
পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ক্রয়-বিক্রয়ের পালা শেষ হোতেই শিবশঙ্করের অফিস ম্যানেজার ও
তদারককার মিঃ ঘোষাল ঢুকে শিবশঙ্করকে খানিকটা নিচু হয়ে নমস্কার জানিয়ে
একটা চেয়ারে বসলেন। দুজনের মধ্যে যে কথাবার্তা সুরু হোল তা ফ্লোর ফুট
রেট, পাসেন্ট, ইম্পাতের জালতি, সিমেন্ট, এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম, গ্যারিসন্
এনজিনিয়ার প্রভৃতি শব্দে পরিপূর্ণ ও কণ্টকিত। আজই মিঃ ঘোষালকে
আপিসের কাজে তেজপুর যেতে হচ্ছে, ফোনে এখুনি আসাম মেলে বার্থ রিজার্ভ

সম্বন্ধে শেয়ালদ' স্টেশনের কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ হোলো। অগ্ন অগ্ন কথার পরে বেলা ন'টার সময়ে মিঃ ঘোষাল বল্লেন—তা হোলে আমি উঠি—

—কত টাকার দরকার ?

—সতেরো হাজার তো ওদের পেমেন্ট করতে হবে, আর পূজোর ব্যবস্থা—তাও তিন হাজার নেবে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, হাজার খানেক দিতে হবে উপদেবতাদের। মিসেস বর্ষগকে একটা প্রেজেন্ট দিতে হবে ভাল দেখে। কি দেওয়া যায়, স্মার, আপনিই বলুন।

—একটা জড়োয়ার কিছু দাও গিয়ে—হাজার খানেকের মধ্যে। বিশ হাজারের একটা চেক নিয়ে যাও—

—আজ্ঞে স্মার, ব্যাঙ্কে টাকা ভাঙানোর আমার সুবিধে হবে না। একটায় আসাম মেল। তার আগে আমার অনেক কাজ। একবার আপিসে যেতে হবে। ড্রয়ারের মধ্যে কাগজপত্র রয়েছে, নিয়ে যেতে হবে। গহনাই বা কিনবো কখন ?

—আচ্ছা, গহনার জন্মে আমি সুরেশকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বজ্রিদাসের বাড়ী। যদি কিছু ভালো থাকে, দেখে আসুক। সেজন্মে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি এখান থেকে বাড়ী যাও—নেয়ে খেয়ে গাড়ী নিয়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে আগে চেক ভাঙাও। ওখান থেকে ইষ্টিশানে চলে যাও—গহনা যদি পাই সুরেশকে দিয়ে ট্রেনে পাঠাবো। মিসেস বর্ষগকে খুশি রাখা চাই মোটের ওপর। দেবতাকে তুষ্ট রাখতে হোলে দেবীর পূজা না দিলে হয় না। কমপিটিশনের বাজার, বুঝে কাজ করবে।

ডাক এল। এক গাদা চিঠি। হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি একবার দেখে নিতে নিতে শিৱশঙ্কর ডেকে বল্লেন—ও রিতুয়া, নিয়ে যা—বড় বৌমার চিঠি, নিয়ে যা—সুলেখার—ছোট বৌমার—ওপরে দিগে যা! আর শোন্—বলে আয় আমি চান করবো এখনি।

খাবার ঘরে বড় পুত্রবধু নন্দা ভাত নিয়ে এলো টেবিলে। ছোট বাটিতে কাঁচামুগের ডাল, বে-মশলার মৌরলা মাছের বোল আর কাগজি লেবু কাটা পৃথক ডিশে। সামান্য একটু ঘরেপাতা দই খেতপাথরের বাটিতে। শিবশঙ্কর খেয়ে হজম করতে পারেন না, লিভারের রুগী। পুত্রবধু বলে—ও বেলা কখন ফিরবেন বাবা?

—তা কি বলতে পারি কখন ফিরবো? নানা কাজ। তারপর আজ অ্যাটর্নির সঙ্গে গুরুতর কাজ রয়েছে। কেন?

পুত্রবধু হেসে বলে—আমরা ভাবছি বেহালা যাবো পিকনিক করতে। গাড়ীখানার দবকার ছিল—

—ও। তা--কটার সময় যাবে। গাড়ী না হয় শোভা সিং আপিস থেকে নিয়ে আসবে এখন। তোমাদের পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে। আসবার সময় তোমরা ট্যাক্সিতে এসো। পৌঁছে গাড়ী ছেড়ে দিও—বিমান কোথায়? ওপরে আছে?

পুত্রবধু মুখ নত করে বলে—তা তো জানিনে বাবা।

—তার মানে? বেরিয়েছে?

পুত্রবধু পায়ে নখে মাটি খুঁটতে খুঁটতে সেদিকে চেয়ে থেকে উত্তর দিলে—
উনি কাল বাত্মবে তো বাড়ী আসেন নি।

—সে কি কথা। কালও আবার আসে নি—হঁ—

শিবশঙ্কর ভ্রু কুঞ্চিত করলেন, আব কিছু বললেন না।

বেলা একটা। শিবশঙ্করের আপিস বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে। বেশি বড আপিস নয়। জন আট নয় কেরাণী বিবিধ খাতা নিয়ে ব্যস্ত। একজন ছোকরা টাইপরাইটারে ঠকঠক টাইপ করছে। শিবশঙ্করকে আপিসে ঢুকতে দেখে সবাই একটু সম্বস্ত হয়ে উঠলো। সম্বস্ত হবার কথা।

দেখতে আপিস ছোট হোক, কিছু দিন আগে এই আপিসে বসেই শিবশঙ্কর

সরকার চালের কারবারে কম করেও সাত লক্ষ টাকা মুনাফা পেয়েছেন। তেরশ' পঞ্চাশ সালে দুর্ভিক্ষের বছর। তেরো সিকে দরে ধানের মণ কিনে সাড়ে ষোল টাকা মণ দরে ধান বিক্রী করেন। চালের কন্ট্রাক্ট নিয়ে এক হাজার টন চাল খরিদ করেন ত্রিপুরা জেলা থেকে। তারপরে সে দেশে চালের দর উঠে গেল চল্লিশ টাকা মণ।

ভালো কাজ করেন নি তা নয়। দেশের বাড়ীতে 'প্রায় দু'হাজার লোককে ফেন-ভাতের খিচুড়ি খাইয়েছেন, কাপড় বিতরণ করেছেন কত লোককে। সম্প্রতি দুটি মিলিটারী কন্ট্রাক্টের কাজে শিবশঙ্কর অনেক টাকা রোজগার করেছেন। দুহাতে ঘুষ বিলিয়েও ছ'লক্ষ টাকা ঘরে এনেছেন। এ বাদে খুচরো কারবার তাঁর অনেক রকম আছে, এই ছোট আপিসটাতে বসে সারা বাজারের বহু গুপ্ত খবর রাখছেন। টেলিফোনের বিরাম বিশ্রাম নেই এক মিনিট। বাজারে তাঁর বহু চর সর্বদা ঘোরাঘুরি করচে, শেয়ার মার্কেট থেকে সর্ষে পর্যন্ত কোনো বাজারের গুপ্ত খবর ওদের জানতে বাকি নেই।

মোটের উপর শিবশঙ্করের দিন যাচ্ছে ভালো, ধুলো-মুঠো ধরলে সোনা মুঠো হচ্ছে। আর কি অসম্ভব খাটিয়ে লোক শিবশঙ্কর! চরকির মত ঘুরছেন এখানে ওখানে, এ আপিস ও আপিস, কত লোকের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করছেন, কত লোক তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করচে—যে লোক এমনি নরম হয় না, তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করে অগ্রসর হতে হচ্ছে, ছুঁচ যেখানে গলে না, সেখানে হাতী গলিয়ে দিচ্ছেন শিবশঙ্কর,—পয়সা কি অমনি হয়?

শিবশঙ্করের অভিজ্ঞতা এই যে, অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে দয়া মায়া চক্ষুলাজ্জা ইত্যাদি দুর্বলতা। যে বিচক্ষণ কারবারী সে এ সব মানবে না। কম্পিটিশনের বাজার, চক্ষুলাজ্জা এখানে খাটে না।

আর একটা অভিজ্ঞতা, অবিশ্বি বড় মূল্যবান অভিজ্ঞতা যে, ঘুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। শিবশঙ্করবাবু বলেই থাকেন—ওহে এমন লোক দেখলাম না

যে পূজো পেলো খেতে চায় না। তবে বেশি আর কম। কেউ চায় ষোড়শো-পচারে পূজো, কারো বা চাল কলা, কারো চিনির নৈবিদ্যি—ঢের ঢের দেখলাম হে, যেখানে ভেবেচি এর কাছে কেমন করে যাবো, এত বড় পদস্থ লোক—পূজো দাও, বাস্ সব ঠিক! সবাই সমান, তবে ওই যে বললাম, বেশি আর কম। চুরি করার সুবিধে জোটেনি যার, সেই সাধু।

বেলা একটার সময় একটি রোগা, দীর্ঘ চেহারার সাহেবি পোশাকপরা লোক শিবশঙ্করের আপিসে এসে ঢুকলো।

শিবশঙ্কর বললেন—কি খবর? আসুন, বসুন।

—বড় বেশি চায়।

—কত?

—সাড়ে পাঁচ কোরে কাঠা।

শিবশঙ্কর বিস্ময়ের সুরে বললেন—জমি কার? ব্যাকের?

—আজ্ঞে না, মাগনলাল মুখনলাল ক্ষেত্রীর। একবার মর্টগেজ আছে। রেজিষ্ট্রী আপিস সার্চ করা হয়েছে।

—বড় বেশি দব বললে না?

—ও অঞ্চলে ওর কম দর নেই। এর পরে সাত পর্যন্ত উঠবে। ন' কাঠা একসঙ্গে আর পাওয়া যায়না স্মার। আপনি কাল নিজে একবার চলুন—বায়নাপত্ৰর রেজিষ্ট্রী না করলে দু তিনটে খদ্দের মুখিয়ে রয়েছে।

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। অল্প খানিকক্ষণ কথা বলে শিবশঙ্কর ফোন রেখে সামনের লোকটিকে বললেন—অ্যাটর্নির আপিস থেকে বলচে হরিশ মুখুষ্যের স্ট্রীটের বাড়ীটা এখনি দেখতে যেতে হবে। চলুন না বাড়ীটা দেখে আসবেন—

উভয়ে মোটরে বার হোয়ে সোজা হরিশ মুখুষ্যে স্ট্রীটে সেই নম্বরের বাড়ীর সামনে এসে দেখলেন মিঃ ঘোষাল তাঁদের পূর্বেই সেখানে মোটর থামিয়ে অপেক্ষা করছেন।

বাড়ীর ওপরের নিচের সব ঘর, বাথরুম, দরদালান, ছাদ সব ঘুরে দেখা হোল। মিঃ ঘোষাল বল্লেন—মতামত দিন মিঃ সরকার।

—মতামত আর কি, নেওয়া হবে।

—তিন পাসে'ণ্টের কথা স্মরণ রাখবেন। ও আমাদের একটা সর্ভ। নয়তো আপনারই হাতে দুটো খদ্দের। আপনি ক্রেতা, আপনার কাছ থেকে কমিশন নেওয়া নিয়ম নয় জানি—কিন্তু এখানে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা—

—সে যা হয় হবে। ইলেকট্রিক ইন্স্টলেশন নেই কেন? অত বড় বাড়ী—

—ছিল। ওয়্যারিং করে নিতে যা খরচ পড়বে তা তো আপনি এমনি বাদ পাচ্ছেন। ওই বাড়ী কি দুইএর কমে হয়—তার লক্ষ সত্তর হাজার পঁচাত্তর হাজার তো উইদাউট এনি ডাউট! আপনি বলুন, এখুনি এক মাড়োয়ারি খদ্দের—

—না, না, সে কথা বলিনি। আপনি নিশ্চিত থাকুন—

শিবশঙ্কর একাই আপিসে ফিরলেন, তখন বেলা পৌনে তিন।

আপিসের চাকর কারুয়া বল্লেন—হুজুর, টেলিফোন দুবার বাজিয়েছে। হামি নম্বর লিয়ে রাখিয়েসে।

—কই নম্বর?

—হুজুরের ঘরের টেবিলমে আছে। মনু বাবুকে দিয়ে লিখিরে রাখিয়েসে। এক তো সাউথ ওয়ান ফাইভ—

শিবশঙ্কর চাকরকে থামিয়ে দিয়ে বল্লেন—আচ্ছা, আচ্ছা, তুই যা—এক পেয়াল চা জলদি তৈরী কর—

—আউর কুছ বাবু?

—আজ বাড়ি থেকে টিফিন আনেনি কেউ? ফলটল?

—না হুজুর। সড়া পোচা দু আপেল হুজুরের টেবিলমে ছিল, ও হামি ফেকিয়ে দিয়েসে—ও কালওয়াল—

—বেশ করিচিস। যা চা নিয়ে আয়—

কারুয়া অনেক দিনের চাকর; আগে শিবশঙ্করের বাড়ীতে ছিল, এখন কাজকর্মের সুবিধের জন্তে ওকে আপিসে নিজের খাসকামরার চাকর রেখেছেন শিবশঙ্কর। শিবশঙ্কর কি খান না খান, কি তাঁর অভ্যেস, কারুয়া এ সব জানে। কারুয়ার আনীত চায়ের পেয়ালাতে চুমুখ দিয়ে শিবশঙ্কর বাবু ভাবছিলেন আরও কিছু জমির সন্ধান নিতে হবে।

জমি বড় দরকার।

এই সব অঞ্চলে বড় বড় প্লটের সন্ধান আছে।

শিবশঙ্কর কাগজকলমে ছোট্ট একটু হিসেব করে নিলেন। লাখ দুই টাকার জমি কিনে রাখতে হবে। টালিগঞ্জের দিকে কিছু জমি এখনো আছে। ব্যাঙ্কের জাম কিছু আছে লোক আর ঢাকুরে যাদবপুর অঞ্চলে।

‘টাকা হোলে মাটি করো’ মস্ত বড় কথা। অত বড় ইনভেস্টমেন্ট নেই টাকার। দালালেরা নানারকম সন্ধান নিয়ে আসে। তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে আছে জমিজমা-সংক্রান্ত নানা রকম খবর, দালালদের দেওয়া। শিবশঙ্কর বাবু ড্রয়ার খুলে অর্ধ-অগ্রমনস্ক ভাবে সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেন। মেদিনীপুর জেলায় শালের জঙ্গল একশো কুড়ি বিঘে এক প্লটে। ধানের জমি ওই সাথে এক প্লটে সত্তর বিঘে, মাঝখানে বড় পুকুর।

বর্ধমান জেলায় ধানের জমি নব্বুই বিঘে। বনপাশ স্টেশনের কাছে।

কুমারডি কয়লাখনির এক তৃতীয়াংশের মালিকানা স্বত্ব, বড় বাংলোধর, ইঁদারা, ছোট বাগান একত্রে।

রানাঘাট টাউনে রেলের নিকট স্টেশন রোডের ওপর দুখানা বাড়ি, রেলের ওপারের বাইশ বিঘের সেগুন বাগান, ইঁটের ভাঁটা।

যশোর জেলায় মৌজা ধরমপুর ও মৌজা চণ্ডীরামপুর—দুইট বড় মৌজা নীলামে উঠেছে। সামনের মাসের বারোই তারিখে যশোর সদরে নীলাম হবে।

লোক পাঠিয়ে শিবশঙ্কর জেনেচেন মৌজার আদায় ভালো, একান্তরটি জমার মধ্যে উনিশটি খাস হয়ে গিয়েচে এবং আশা আছে আরও আটটি জমা এই বছরের মধ্যেই খাস হবে। বাকী খাজনা পড়ে আছে প্রজাদের কাছে কয়েক হাজার টাকা।

হাজারীবাগ জেলায় সিংজানি-ভোজুড়ি অত্রের খনি ও শালবন, বাংলো, ইদারা এবং কিছু ধানের জমি।

উল্টোডিঙির খাল ধার থেকে সামান্য দূরে ৩মহেশচন্দ্র সিমলাইয়ের বাগান-বাড়ী ও পুকুর, বাগানে জমির পরিমাণ দশ বিঘে। কলমের আম, লিচু, ফলস ম্যান্ডোমিটন প্রভৃতি ফলের গাছ। দোতলা বাড়ী।

অত্রের খনির ওপর ঝাঁক বেশী শিবশঙ্করের। দু'পার্সেন্টের অনেক বেশী আসবে টাকার ওপর। স্বাস্থ্যকর স্থান, মাঝে মাঝে গিয়ে থাকাও যাবে, কলকাতায় তো যা খান হজম হয় না, লিভারের রোগে কষ্ট পাচ্ছেন।

আর বাকী সব পাড়ার্গেয়ে জমিজমা, ধানক্ষেত—নাঃ ওদের কি মূল্য আছে? জমি কিনতে গেলে কলকাতায়। কলকাতার সম্পত্তির মত সম্পত্তি নেই—বাড়ী বা জমি। মহেশ সিমলাইয়ের বাগানবাড়ী ভালো, ফলবান গাছ অনেক-গুলো, নার্সারি করবার জন্তে কেউ ভাড়া নিতে পারে, অনেকখানি জমি—মূল্যবান সম্পত্তি হয়ে উঠতে পারে দু'চার বছর পরে। দালালে বলচে আটষড়ি হাজার, তিনি বলচেন পঞ্চাশ হাজার। যদি ওটা হয়, তবে খুবই ভালো।

শিবশঙ্কর ফেঁপে উঠলেন তো সেদিন। ক'বছরের কথা আর? কি ছিল শিবশঙ্করের? বারাসাতের কাছে ভবনহাটি বিষ্ণুপুর, ক্ষুদ্র গ্রাম, সেখানেই পৈতৃক বাড়ী। অবিগ্ৰি নিতান্ত গরীব ছিলেন না, সেকলে বড় গৃহস্থ, তবে ইদানীং নামেই ছিল ভালপুকুর, ঘটি ডুবতো না।

নিজের বুদ্ধিতে শিবশঙ্কর সব করেচেন। বীরের মত করেচেন, বীরের মতই

ভোগ করে যাচ্ছেন শিবশঙ্কর । এখনো হয় নি, লোক অঞ্চলে বড় একখানা বাড়ী করবার সখ তাঁর, কিন্তু পছন্দসই জমি পাচ্ছেন না ।

তেজপুরের কাজটা যদি হাতে এসে যায়, তবে নির্ঘাত তিন লক্ষ ঘরে আসবে । হিসেব করে দেখা আছে তাঁর । এই বছরের শেষেই টাকাটা হাতে আসতে পারে, যদি বিলের টাকা গভর্নমেন্ট এ বছরেই শোধ করে । পূজো দিলে শেষের ব্যবস্থা চটপট হয়ে যাবে । শিবশঙ্করকে কাজ শেখাতে হবে না, ঘুঘু হয়ে বসে আছেন তিনি । অনেস্টি বলে জিনিস নেই এ বাজারে । অনেস্টি একটা মুখের কথা মাত্র । কমপিটিশনের বাজার, অনেস্টিতে হয় না । টাকা...টাকা...চাই, টাকা । ছনিয়াতে টাকা ছাড়া আর কিছু নেই । টাকা যে পথে আসে আসুক । টাকা রোজগারের এই তো সময় । যুদ্ধেব বাজারে যে যা করে নিতে পারে । কলকাতার হাওয়ায় টাকা উডচে...যার বুদ্ধি আছে ধরে নাও । কিছুই এখনো রোজগার করা হয় নি । অনেক কিছুই বাকী ।

কেবল একটা ব্যাপার শিবশঙ্করকে বড় চিন্তিত করে তুলেচে ।

বড় ছেলে বিমান প্রায়ই রাতে বাড়ী আসে না । নিজের আলাদা একখানা মোটর কিনেচে । নানা রকম কথা কানে গিয়েচে শিবশঙ্করের । ঠিক বুঝতে পারছেন না এখনও তিনি । বিমান এমন ছিল না । বড় বোমা প্রায়ই কাঁদেন, সুলেখার মুখে শুনতে পান তিনি । গিন্নি কিছু বলেন না, এজ্ঞে গিন্নিব ওপর শিবশঙ্কর সন্তুষ্ট নন । গিন্নির প্রশ্রয় না পেলে বিমান এমন হোতে পারতো না । যত নির্বোধ নিয়ে হয়েচে তাঁর সংসার ।

টেলিফোন বেজে উঠে শিবশঙ্করের চিন্তাজাল ছিন্ন করে দিলে । —হ্যাঁ, কে ? ও আচ্ছা—বেশ, বেশ । তুমি চলেই এসো এখানে । দেরি করো না ।

একটি সৌখীন বাবুমত লোক, চোখে সোনারাঁধানো চশমা, ঘরে ঢুকলো দশ মিনিট পরে । এই লোকটি ঘরে ঢোকবার পরে শিবশঙ্কর সতর্ক দৃষ্টিতে ঘরের

দরজার দিকে দু-তিনবার চাইলেন। লোকটি চাপা স্বহৃদে মিনিট দশেক কথা বলে তারপর হঠাৎ স্বাভাবিক সুরে ফিরে এসে বলে—বেশ, যাই তা হোলে।

—বোসো, বোসো—

—বুঝতে পারলে না? সামলে রাখতে বলিগে যাই। সিনেমায় আজকাল নাম করে উঠেচে ঠেলে, দেখতে পরমা রূপসী—মৌমাছির ঝাঁক কম নয়। বুঝতে পারলে না? ঠিক আর্টটাতে—

বেলা ছ'টার পরে শিবশঙ্কর ড্রাইভারকে ডেকে বলে দিলেন—শোভা সিং, চলা যাও বেহালামে। বৌমাদের লে আও। হাম ট্যাঙ্কিমে যায়েঙ্গে। ঠিক করে লে আও, যেন মিলিটারি গাড়ীমে ধাক্কা মৎ লাগে—

‘বহুৎ আচ্ছা হুজুর’ বলে শোভা সিং গাড়ী নিয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত আপিসে নানা কাজ সেরে সাড়ে সাতটার সময় শিবশঙ্কর ট্যাঙ্কি নিয়ে বার হোলেন। ভবানীপুরের একটা ছোট গলির মধ্যে গাড়ী ঢুকলো। আগের সৌখীন লোকটি বারান্দা থেকে নেমে এসে বলে—এসো ভায়া, এসো—চা খাবে না?

—আর এখন চা নয়। চলো—

এখনো দেরী আছে। আমি কাপড পরে নি। আসচি—

দুজনে আবার গাড়ী নিয়ে চলেন—বেলতলা রোডের পার্কের কাছাকাছি একটা বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী দাঁড়ালো। দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। লোকটি বলে—আমি ফোন করেছিলুম, আর্টটার সময় সব সরিয়ে দিও। খুব সুন্দরী, আর বয়েস উনিশের বেশী নয়। নিজের চোখেই চাখো ভায়া, এ শর্মার নাম গোপাল চক্কোত্তি। মাসে চারশোতেই রাজি করিয়ে দেবো—তুমি শুধু দেখে যাও—সিনেমাতে আজকাল নাম কি! যত সব চ্যাংড়া ছোকরার ভিড় সেই জন্তে—

ওপরে দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর বারান্দা, ফুলের টব সাজানো।
অর্কিডের টব ঝুলচে বারান্দার ছাদের প্রান্ত থেকে।

সঙ্গী লোকটি কড়া নাড়তেই ওদিকের দরজা দিয়ে যে তরুণটি সিগারেট মুখে
বেরিয়ে এসে পাশের সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেল—শিবশঙ্কর যেন ভূত
দেখলেন তাকে দেখে।

শিবশঙ্করের সঙ্গী বলে—ওই ঠাখো, যত সব ছেলে ছোকরার মরণ—দিনেয়ার
ইয়ে কিনা? আসল কমপিটিশন্ হচ্ছে এদের কাছে টাকায়—সে কমপিটিশনে
দাঁড়ানো চ্যাংড়াদের কর্ন নয়—ও কি! দাঁড়ালে যে? কি হোল?

শিবশঙ্কর ততক্ষণ দম নিলেন।

যে ওদিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, সে বিমান, তাঁর ছেলে বিমান।

১/ ল্যাকমার্কেট দমন কর

চিঠিখানা পাইয়া বড়ই রাগ হইল। সকালে চা পান করিয়া সবে সেরেস্ভায় আসিয়া বসিয়াছি, আর অমনি পিওন আসিল। ঘড়িতে দেখিলাম মাত্র আটটা। বলিলাম—আজ এত সকালে ?

পিওন বলিল—না বাবু, সকাল আর কই ? আপনার ছুটো মনিঅর্ডার আছে, তাবলাম আগে বিলি করে তবে অণু জায়গায় যাই—একটু পরে মক্কেলের ভিড় হোলে তখন আপনি ফুরসৎ পাবেন না হয়তো। নিন, সেই ছুটো করে দিন—পঞ্চাশটাকা আর আটাশটাকা এগারো আনা—

মক্কেলদের টাকা অবিশি। কোর্টের খরচা। বিজন মুহুরীকে ডাকিয়া বলিলাম—গাথো তো এসমাইল বন্দি বাদী, ফজলুল গাজি বিবাদী। কেসের তারিখটা কত ?

বিজন আমাদের সেরেস্ভায় অনেকদিন মুহুরী। আমার ও আমার দাদার। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের আমল হইতে উহারা এখানে আছে। বিজনের বাবা ৬রামলাল চক্রবর্তী আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের মুহুরা ছিলেন। আমাকে ও আমার দাদাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। বিজনের সঙ্গে বাল্যে খেলাধুলা করিয়াছি, আবার সেই বিজন আমাদের সেরেস্ভায় মুহুরীগিরি করিতেছেও আজ বাইশ বৎসর। খুব ছ শিয়ার লোক।

বিজন খাতা দেখিয়া বলিল—২২শে আগস্ট। কত টাকা পাঠিয়েচে এসমাইল ?

—আটাশ টাকা এগারো আনা—

—ফেরৎ দিন মনিঅর্ডার, সেই করবেন না বাবু—

—কেন ?

—আপনার চার টাকা আর কোর্টফির দরুন আমার কাছে ধার দুটাকা ওর মধ্যে ধরা নেই।

—ঠিক তো ?

—ঠিক বাবু, এই দেখুন খাতা —

লিখিয়া দিলাম 'রিফিউজ্‌ড'। অণ্ট সই করিয়া লইলাম, মুহুরীকে বলিলাম — টাকা দেখে নাও। ভজু চাকর আসিয়া বলিল—বাবু, বাজারের টাকা —

—দাদার কাছে নিগে যা—

—তিনি বাড়ী নেই। বেড়িয়ে ফেরেননি এখনো। মা ঠাককন বলে দিলেন, মাছ এক সের আর মাংস এক সের লাগবে।

—মাংস আবার কি হবে আজ ? আঃ বিরক্ত করলে সব। খরচ করেই সব উড়িয়ে দিলে। রোজ মাংস। নিয়ে যা একখানা নোট—বিজন একখানা দশ টাকার নোট দাও তো ফেলে এদিকে। দুধের তিন টাকা শোধ কবে দিয়ে আসবি আজ। বুঝলি ?

পিওন হাসিয়া বলিল—বাবু, আপনাদের বড সংসাবে আপনারা যদি রোজ মাংস না খাবেন তো খাবো কি আমরা ? আপনাদের দিয়েচেন ভগ্ন খেতে। আপনারা খাবেন না ? ও আড়াই টাকা মাছের সের হোলেও আপনাদের গায়ে লাগে না, তিন টাকা হোলেও আপনাদের গায়ে লাগে না। আমরা এক টাকাতাই মরি।

পিওন ও চাকর চলিয়া গেল। যাইবার সময় আমার ইঙ্গিতে বিজন পিওনকে একটা সিকি ফেলিয়া দিল। দুজন চাষীলোক ঘরে ঢুকিয়া বলিল—বাবু ছালাম। শরৎ বাবু উকিলের বাড়ী কি এডা ?

—হ্যা, কেন ?

—একটা মকদ্দমা আছে বাবু। আর্জি করে দিতে হবে একটা—

—কি কেস ? কোথায় বাড়ী ?

—বাবু, আমার বাড়ী রাইপুর আর এ আমার খালাতো ভাই, এর বাড়ী ন'হাটা। আমাদের একটা আমবাগান ছেল—তা আমার চাচা হবিবর সেখ—

মক্কেল জটিল গল্প ফাঁদেবে বুঝিয়া বিজন মুহুরীকে বলিলাম—এদের কেস শোনো। আমি ততক্ষণ ডাকের চিঠিগুলো দেখে নি—খবরের কাগজখানা চোখ বুলিয়ে ঘাই। যাও তোমরা শুদিকে যাও—টাকা এনেচ স্ঙ্গে ?

—ই্যা বাবু!

—কত টাকা? আরজি করার ফি ছ'টাকা লাগবে। সব জিনিসের দাম বেড়েচে, চার টাকায় আর হবে না।

—তা দেবো বাবু বা লাগে—আমাদের শুন্নন তবে বাবু কি নেগগেরো, এই আমার খালাতো ভাই—

—যাও শুদিকে যাও—

এইবার ডাকের চিঠি খুলিতে খুলিতে এই চিঠিখানা পাইলাম। পড়িয়া বিস্মক্তি বোধ হইল। চিঠিখানা এই—

শুভাশীর্ষাদমস্ত রাশয় বিশেষঃ

বাপজীবন অত্র সকল কুশল জানিবা। তোমাদের অনেকদিন কোন সংবাদ পাই নাই। পরে লিখি যে আমাদের গৃহদেবতা শালগ্রামের পূজার জন্তু তোমরা যে ২৥৩০ প্রতি মাসে পাঠাইয়া থাক, তাহা এ যাবৎ নিয়মিত পাইয়া আসিতেছি। কিন্তু লিখি যে বর্তমান অবস্থায় সকল জিনিস আক্রা। এক সের আলো চাউলের মূল্য মাখমহাটির বাজারে আট হইতে দশ আনা। একটি পাকা কলা এক পয়সা মূল্যে হাটে বিকায়। এ অবস্থায় পূজার দরুন প্রতি মাসে ছয় টাকা করিয়া না দিলে আর পারা যাইতেছে না। সকল দিক বিবেচনা করিয়া আগামী মাস হইতে ছয় টাকা করিয়া পাঠাইবে। খুড়া মহাশয় রামধন চক্রবর্তী সম্প্রতি পারে

আঘাত পাইয়া বড় কষ্ট পাইতেছেন জানিবা। বধুমাতাদের আশীর্বাদ জানাইবা।

ইতি—

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীহরিসাধন দেবশর্মা

সাং বাহিরগাছি। বর্ধমান জেলা।

একটু পরে দাদা বেড়াইয়া ফিরিলেন, তাঁর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বিজনকে বলিলাম—একবার বড়বাবুকে ডাক দাও তো। উনি বোধ হয় সেরেস্তার গিয়ে বসেচেন।

দাদা আসিয়া বলিলেন—কি রে ?

—এই দেখো হরি ভটচাজ আজ দেশ থেকে চিঠি লিখেচে, ছ' টাকা না পাঠালে মাসে মাসে আর সে ঠাকুরপূজো করবে না।

দাদা পত্র পড়িয়া ক্রকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—ও ! ঠাকুর-পূজোতেও ব্র্যাক মার্কেট ! দয়া করে তো টাকা দিচ্ছি। নামেই পৈতৃক ভিটে, কখনো যাইও নে। জাতিরা বাড়ীতে আছে। ও টাকা তো ষ্টাইপেন্ডের সমান দিচ্ছি—আমরা। বেশ, না পূজো করেন, না করবেন। টাকা একদম বন্ধ করে দাও সামনের মাসে। গৃহই নেই তো গৃহদেবতা।

তাহাই করিলাম। দুমাস কোনো টাকা গেল না। চিঠিপত্রও নয়।

ছ' মাস পরে আর এক চিঠি দেশের। খুলিয়া পড়িলাম—

শুভাশীর্বাদমস্ত রাশয় বিশেষঃ

অত্র পত্রে কুশল জানিবা। পরে লিখি যে বাপাজীবন তোমাদের পৈতৃক গৃহদেবতা শালগ্রাম সেবার জন্ম যে ২৥৩০ করিয়া মাসে মাসে পাঠাইয়া থাকে। তাহা আজ দুই মাস বন্ধ হওয়ার কারণ কিছু বুঝিলাম না। আমরা তোমাদের বংশের কুলপুরোহিত। বর্তমানে অবস্থা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। যাহা

পাঠাইতেছিলে না দিলে পূজাও বন্ধ হয়, সংসারের সাহায্যও পাওয়া যায় না।
অতএব টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করিবা না। খুড়া মহাশয় সম্প্রতি স্তম্ভ হইয়া
উঠিয়াছেন। পত্রপাঠ টাকা মনি অর্ডার যোগে পাঠাইবা। বধুমাতাদের
আশীর্বাদ দিবা।

ইতি

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীহরিসাধন দেবশর্মা

সাং বাহিরগাছি, বর্ধমান জেলা।

দাদাকে পড়াইলাম। দাদা বলিলেন—দাও পাঠিয়ে। বদমাইসি ঠাণ্ডা হয়ে
গিয়েচে। ব্ল্যাক মার্কেট করতে এসেচে ঠাকুরপূজোষ।

সেইদিনই দাদার বড় ছেলে—শুভেন্দু কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিল।
তাহার পরনে কাঁচি ধুতি দেখিয়া বলিলাম—এ কোথাও পেলি রে? কত
নিলে?

শুভেন্দু প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। দাদার বড় ছেলে। বেশ সৌখীন।
সে হাসিয়া বলিল—কাকা, কত বলো তো?

—কি জানি বাপু, আমরা বুড়ো মানুষ। ও সব আগে তো পাঁচ ছ'
টাকা ছিল।

—ত্রিশ টাকা একখানা। তাও লুকিয়ে এক দোকান থেকে সন্ধ্যার পর
কেনা। এমনি কোথাও মেলবার জো নেই। ভাল না? জরিব আজি
ছাথো—

এই সময়ে দাদাও আসিলেন। দুজনেই কাপড় দেখিলাম। দেখিয়া
শুভেন্দুর ক্রয়-নৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম।

তুচ্ছ ১

আমি সকালে উঠে বসে কাগজপত্র নিয়ে ঘাটচি, এমন সময়ে একটি তেরো চৌদ্দ বছরের ছোট মেয়ে রাঙা শাড়ী পরে আমাদের বাড়িতে ঢুকলো। আমাদের গ্রামেরই মেয়ে নিশ্চয়, তবে এ'কে কোথাও দেখিনি বলে চিনতে পারলাম না। মেয়েটির এই অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছে, ঞর কপালে সিঁছর, হাতে সোনা বাঁধানো শাঁখা। শ্যামবর্ণ, একহারা চেহারার মেয়ে। মুখখানি বেশ চলচল, বড় বড় চোখ দুটি। কানে দুটি সোনার ছল। জিজ্ঞেস করলুম—কার মেয়ে তুই রে ?

মেয়েটি সামান্য একটু হেসে মাটির দিকে চোখ রেখে বল্লে—বিশ্বনাথ কামারের।

—বিশ্বর মেয়ে ? বেশ, বেশ। তোর দেখচি বিয়ে হয়েছে এই বয়সে। কোথায় ঞশুরবাড়ি ?

মেয়েটির খুব লজ্জা হোল ঞশুরবাড়ির কথায়। সে মুখ অত্ৰদিকে ফিরিয়ে বল্লে—নারানপুর।

—কোন্ নারানপুর ? ঞিবে-নারানপুর ?

—হ্যাঁ।

—কদ্দিন বিয়ে হয়েছে ?

—এই ফাল্গুন মাসে।

—ঞশুরবাড়ি থেকে এলি কবে ?

—পরন্তু এসেচি কাকাবাবু।

—আচ্ছা যা বাড়ির মধ্যে যা।

গ্রামের মেয়ে বাপের বাড়ি এসেচে, এ পাড়া ও পাড়ায় সব বাড়ি ঘুরে বেড়াচে। বড় ঞ্নেহ হোল ঞুকিটির ওপর। এই গ্রামেরই মেয়ে, আহা !

কিন্তু খানিকক্ষণ পরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখি মেয়েটি মাঝের ঘরের মেজেতে চুপ করে বসে আঁচল নিয়ে নাড়চে। কেউ ওর দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না, কেউ ওর সঙ্গে কথা বলচে না। প্রথম প্রথম হয়তো কথা বলেছিল মেয়েরা, এখন আর ওর কাছাকাছি কেউ নেই, ও একাই বসে আছে। কামারদের মেয়ে, তার সঙ্গে কে কথা বলে বেশিক্ষণ?

আমায় দেখে মেয়েটি বলে—কাকাবাবু, ও কিসের ছবি?

—ও আমার ফটো।

—আপনার ছবি?

মেয়েটি ফটো কথা বোধ হয় বুঝতে পারেনি। বল্লুম—হ্যাঁ আমার ছবি।

—কে করেছে কাকাবাবু?

মেয়েটি এতক্ষণ বিস্ময় ও প্রশংসার দৃষ্টিতে ঘরের দেওয়ালের কতকগুলো ফটো, সিগারেটের বিজ্ঞাপনের মেমসাহেব, ক্যালেন্ডারের ছবিগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। পল্লীগ্রামের ঘরের দেওয়ালে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, ঘামিনী রায় বা রেনব্রাণ্টের ছবি অবিশ্রি টাঙানো ছিল না।

—ও মেমসাহেব কি করেছে কাকাবাবু?

—সিগারেট খাচ্ছে।

—ওমা, মেয়েমানুষ সিগারেট খায়?

—মেমসাহেবরা খায়। দেখেচিস্ কখনো মেমসাহেব?

—হঁ।

—কোথায়?

—রানাঘাট ইষ্টিশানে। আড়ংঘাটা যাচ্ছিলাম যুগলকিশোর দেখতে, তাই দেখি রেলগাড়িতে বসে আছে। সাদা ধপ ধপ করচে একেবারে।

দেখলুম ও একা বসে থাকলেও দেওয়ালের ওই অকিঞ্চিৎকর ছবিগুলো দেখে বেশ আমোদ পাচ্ছে। আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমি আবার ঢুকলাম

ঘরে কি কাজে। মেয়েটি সেখানে ঠায় বসে আছে সেই ভাবেই। ওকে কেউ গ্রাহ্যও করচে না বাড়ির মেয়েরা। তাতে ওর কোনো দুঃখ নেই, দিব্যি একা একা বসে আছে। চলেও যায় নি।

ও যে আমাদের ঘরে ঢুকে মেজের ওপর বসে আছে, এই আনন্দে ও ভরপুর। দিব্যি লাল রং দেওয়া মাজাঘসা মেজে, ঘরের বিছানা আসবাবপত্র দামী নয়, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালে যে শ্রেণীর ছবি, সে তো বলাই হোল। একখানা টেবিল, একটা চেয়ারও আছে। টাটার টেবিল ল্যাম্প আছে একটা। কতকগুলো মাটির পুতুল—যেমন গণেশ-জননী, গক, হরিণ, টিরাপাখী, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি—একটা কাঠের তাকে সাজানো আছে।

গৃহসজ্জার এই সামান্য রূপই ওর চোখে আশ্চর্য্য ঠেকেচে, খুকির চোখ দেখলে তা বোঝা যায়। আমার কষ্ট হোল ওকে কেউ আদর করে ওর সঙ্গে কথা বলচে না। ও সেটা আশাও করেনি। আমাদের গ্রামে তেমন ব্যবহার কামার কুমোরদের মেয়েদের সঙ্গে কেউ করে না। ওরা ঘরে ঢুকে বসতে পেয়েচে, এতেই ওরা অত্যন্ত খুশি আছে।

আমি তেল মেখে নাইতে যাবো। নারকোল তেল আজকাল পাওয়া যায় না বলে বাড়ির মেয়েদের ফরমাজ মত গন্ধতেলের বোতল আসে দোকান থেকে—হেন কল্যাণ, তেন কল্যাণ।

আমি বোতল থেকে তেল বের করে মাথায় মাখি দেখে ও চেয়ে রইল।

আমি বললাম—গন্ধতেল একটু মাখবি, খুকি ?

মেয়েটি অবাক হয়ে গেল ! এমন কথা কেউ ওকে বলে নি, কোনো ব্রাহ্মণ-বাড়ির কর্তা তো নয়ই।

বল্লে—হ্যাঁ !

—সরে আয় দিকি মা।

তারপর তার চোখদুটির অবাক দৃষ্টিকে অবাকৃতর করে দিয়ে আমি নিজের

হাতে তার মাথায় খানিক গন্ধতেল মাখিবে দিলাম, খোঁপা বাঁধা চুলেব ওপর ওপর। ও হেসে ফেল্লে। অনাদৃতা আদর পেয়ে লজ্জা পেলো।

বললাম—কি রকম গন্ধ ?

—চমৎকাব, কাকাবাবু!

—কি তেল বল দিকি ?

—জানি ?

—খুব ভাল গন্ধতেল।

ভারি খুশি হয়েছে ও।

বল্লে—আসি তা হোলে কাকাবাবু? বেলা হয়েছে।

—এসো মা। আবাব এসো একদিন—

চলে গেল খুকী। কতটুকু আর তেল দিলাম ওর মাথায়। কিন্তু কি আনন্দ আমার স্নান কবতে নেমে নদীজলে। উদার নীল আকাশে কিসের যেন সুস্পষ্ট, সৌন্দর্যময় বাণী। অন্তরের ও বাইরের বেথায় রেখায় মিল। চমৎকার দিনটা। সুন্দর দিনটা।

পিঁদিমের নোচে

একটিমাত্র গ্রামে আমার বাল্যে এই ধরণের এক ব্যক্তিকে আমি দেখেছিলাম। কেউ তার জীবনচরিত লেখেনি, কেউ জানেও না তাকে, কিন্তু আমি জানি এবং যতটুকু জানি বা নিজের চোখে দেখেছিলাম, লিখে রাখা উচিত ভেবে লিখে রাখলাম।

আমার ছেলেবেলায় দিন কতক মাসীর বাড়ীতে কাটিয়েছিলাম সে গ্রামে। আমার তখন বয়স ন' দশ বছরের বেশী নয়।

গঙ্গার ধারের পথ দিয়ে একদিন মাসতুতো ভাই নন্দর সঙ্গে পাশের গ্রাম আমিনপুরে চাল আনতে যাচ্ছিলাম। বিকেল বেলা, বর্ষা কাল, গঙ্গার জলে খুব ঘোলা এসেচে, জল বেড়ে সাতনলির বড় চড়া ডুবে গিয়েচে, ঝিঙে পটলের ক্ষেত জলের অত্যন্ত ধারে এসে পড়েচে।

হঠাৎ নন্দ আমায় ধমক দিয়ে বল্লে—এই, সরে আয়।

--কি রে ?

আমার মুখ থেকে কথা বেরতে না বেরতে রূপ করে অনেকখানি পাড় ভেঙে পড়লো অনেক নিচে ঘোলা জলের আবর্তের মধ্যে। আমার শরীর ঝিমঝিম করতে লাগলো।

নন্দ বল্লে—এখুনি গিইছিলি যে।

সত্যই তাই। আর একটু হোলে আমি গিয়ে পড়তাম গঙ্গাগর্ভে। তখন সাতার জানতাম না। জলে পড়লে আর বাঁচবার উপায় ছিল না। আমার বড় ভয় হোল, গঙ্গার ধার বেয়ে বেয়েই রাস্তা অনেক দূর চলে গিয়েচে! যদি আবার পাড় ভাঙে, বিশ্বাস কি।

নন্দকে বল্লাম—নন্দদা, আমি যাবো না, তুই যা। আমি বাড়ী যাই—বলেই স্বীকার করতে এখন লজ্জা হয়, কেঁদে ফেললাম।

নন্দ কাছে এসে বল্লে—ওই ঠাখো, নাও, কেঁদে উঠলি কেন? কি মুন্সিলেই পড়ো'গেল ঠাখো। বাড়ী যেতে পারবি নে একলা। চল্ তোকে পাগল ঠাকুরের আশ্তানায় রেখে আসি।

এইভাবে এই অদ্ভুত লোকটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো।

এ ঋতুতে আমি আছি আজ মাস দুই। পাগল ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনে আসচি এতদিন। শুনেছিলাম প্রথম আমাব মাসিমার মুখে। আমি বলেছিলাম—সে কে মাসিমা?

—গঙ্গার তীরে থাকে। সাতনলির চরেব এপারে।

—কে সে?

—জেতে বুনা। ওখানে আশ্তানা করে আছে ঘর বেঁধে আজ বিশ ত্রিশ বছর। আমার তো বিয়ে হয়ে এখানে এসে এসুক শুনে আসচি। অনেক ছোট জেতের গুরুদেব। মাঘ মাসে তাব ওখানে মেলা বসে, লোকজন আসে, দোকান পসার জমে।

—আমি একদিন দেখতে যাবো?

—না, যায় না। বুনো বাগ্দি, ছোট জেতের কাণ্ড, সেখানে কি দেখতে যাবি তুই? ছু লে যাদের গঙ্গাস্নান না করলে শুকু হয় না।

সেই বিকেলে আমার মাসতুতো ভাই নন্দ আমার পাগল ঠাকুরের আশ্তানায় বসিয়ে রেখে চলে গেল। বল্লে—ফিরে না আসা পয্যন্ত বসে থাকবি—

একটা বাবলা বনের মধ্যে ছ'খানা খড়ের ঘর। একটা ছোট গোয়াল ঘর, তাতে দুটি গাই-গরু বাঁধা। একখানা ঘরের দাওয়া অত্যন্ত নিচু, সেখানে খানকতক পিঁড়ি আর খেজুরের চেটাই পাতা। বাবলা গাছে ফুল ধরেচে, ফুল ঝরে ঝরে নিকোনো পুছোনো পরিষ্কার উঠোনটা ছেয়ে রেখেচে। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গোয়াল ঘরে ঘুঁটের সঁজাল দিচ্ছে। আর কেউ কোথাও নেই।

এমন সময় একটি লোক বাবলা বনের ওধার থেকে বড় ঘরখানার দাওয়ায়

এসে একখানা দা রেখে দিলে। তার কাঁধে এক বোঝা সবুজ জোলো ঘাসের ঝাঁটি। লোকটার লম্বা দাড়ি বুকের উপরে পড়েছে, মাথায় লম্বা লম্বা জট পাকানো চুল, পরনে অতি মলিন এক কাপড়—দেখে পাগল বলে মনে হয়।

লোকটা আমাকে লক্ষ্য করে বলে—কে ওখানে? কে গা?

আমার ভয় হয়েছে। আমি আমতা আমতা করে বললাম—এই—এই—এই—
আমার মাসীর বাড়ী—

সেই বৃদ্ধা বলে—বাঁওনদের ছেলে। বোধ হয় বাবুদের বাড়ীর। ভূপেনবাবুর নাতি নন্দ বসিয়ে রেখে গেল। ভয় কি খোকা? ভয় কি? শশা খাবা?

শশা খাবো কি, লোকটার হাবভাবে ও রক্তবর্ণ বড় বড় চোখ দেখে আমার প্রাণ তখন উড়ে গিয়েছে। আমি কাঠেব পুতুলের মত আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি। দস্যু-ডাকাতের গল্প শুনেচি, সেই দস্যু-ডাকাতদের একজন নয় তো?

হঠাৎ লোকটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলে—ভয় কি, বাবাঠাকুর? ভয় কি? কিছু ভয় নেই। বোসো।

তারপর একেবারে কাছে এসে অত্যন্ত মোলায়েম স্নেহের হাসি হেসে বলে—
আহা, বালক!

আমি চুপ করে বসে আছি। বোবার শত্রু নেই।

লোকটা বলে—নাম কি বাবাঠাকুর?

ভয়ে ভয়ে বললাম—পতিতপাবন মুখোপাধ্যায়—

—পতিতপাবন? বাঃ, বেশ, বেশ। পতিতপাবন যিনি, তিনিও তোমার মত। আহা-হা! আহা!

লোকটা শেষের কথাগুলো কাঁদো কাঁদো সুরে জোরে জোরে উচ্চারণ করলে। তারপর বলে—ওগো, পতিতপাবনের ভোগ দেবে কি দিয়ে? আমার বাড়ী এসেচেন দয়া ক'রে, সে অদৃষ্ট করিনি যে বাবাঠাকুর। তোমার ও মুখে কি তুলে

দেবো? পাকা তাল একটা নিয়ে যাও—তালের বড়া ভেজে দিতে বোলো তোমার মাসিমাকে—

আমার কথাগুলো ভাল লাগলো এবং ভয়ও অনেক চলে গেল। কিন্তু ওর রকম স্কম দেখে মনে হোল লোকটা পাগল ঠিকই। তাই ওকে পাগল ঠাকুর বলে।

পাগল ঠাকুর ছোট ঘরটার দাওয়ার গিয়ে বসে আমায় কাছে ডাকলে। হাতছানি দিয়ে বলে—এসো পতিতপাবন, এসো, এসো—

বুঝা বলে—ওকে ডেকো না, ভয় পেয়েচে।

কিন্তু আমি সম্প্রতি নির্ভয় হয়েছি দেখাবার জন্তে পাগল ঠাকুরের পাশে গিয়ে বসলাম। পাগল ঠাকুর একখানা খেজুরের চেটাইয়ের উপর বসে এক বন্ধি তামাক না গাঁজা কি সাজলে। আমায় বলে—তুমি বাঁওন?

—হ্যাঁ।

—পায়ের ধূলো দেবা একটু?

—আমায় ছুঁয়ো না। মাসিমা বারণ করেছে।

পাগল ঠাকুর হেসে উঠে বলে—কেন, নাইতে হবে বুঝি? তা আমায় ছুঁলে তোমায় নাইতে হবে না। আমি বাঁওন নই, কিন্তু দয়াল গুরুর নামে থাকি। তিনি আমাদের সকলের চেয়ে বড়। দাও, পায়ের ধূলো—

পাগল আমার পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে কি যেন একটা অদ্ভুত ভাব হোল। একটা অদ্ভুত আনন্দের ভাব, সে মুখে বলে বুঝিয়ে দিতে পারবো না, বিশেষত তখন আমি বালক, বিশ্লেষণ ও তুলনা করে দেখবার ক্ষমতা ছিল না। এখন এক একবার ভাবি, পাগল ঠাকুরের পায়ের ধূলো নেওয়াটা হয়তো একটা ছুঁতো—আমাকে স্পর্শ করার জন্তেই ও পায়ের ধূলো নিতে চেয়েছিল।

তারপর ও একটা গান করলে। গান আমার মনে নেই, কিন্তু বেশ গলার

সুর ওর। গান গাইতে গাইতে ওর চোখে জল এল, গাল বেয়ে জল পড়তে লাগলো। “ও আমার হৃদ-কমলের পরমগুরু সাঁই”—এই কথাটা বার বার ছিল গানের মধ্যে।

গান শেষ করেও বার বার বলতে লাগলো—কিছু খাওয়াতে পারলাম না, বাবাঠাকুর। একটা পাকা তাল নিয়ে যাও, বড়া করে দিতে বলো তোমার মাসিমাকে।

আমার ভয় এগন সম্পূর্ণরূপে কেটে গিয়েছিল। আমি বললাম—তুমি কি কর এখানে?

পাগল ঠাকুর হা হা করে হেসে উঠে আমার দিকে চাইল। তারপর সস্নেহ সুরে বলল—বাবাঠাকুরের কথা শোনো। হাসতে হাসতে মরি যে! খুব আনন্দ জুটিয়ে দিলেন আজ সন্দেরবেলা গুরুগোসাঁই। বলে কিনা—কি কর? আমি এখানে থাকি বাবাঠাকুর। আর কি করবো? গুরুগোসাঁইকে ডাকি।

—কে সে?

—ওই, ওই—

পাগল আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখিয়ে বলল—উনি।

আমার খুব ভাল লাগছিলো এই অদ্ভুত লোকটাকে। এই অলক্ষণের মধ্যেই আমি তার দিকে যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি, দেখলাম। এই সময় সন্দের অঙ্ককার নামলো। গায়ের রোঁয়া আর দেখা যায় না। ও উঠে দোরে জল দিয়ে ধুনো জ্বাললে। উঠোনের একটা ইঁটের মত উঁচুমত জায়গাতে প্রতীপ নিয়ে গিয়ে রেখে দিলে। আমি বললাম—তোমাদের তুলসীগাছ নেই?

—কেন বাবাঠাকুর?

—আমাদের বাড়ী আছে। মাসিমা পিদিম দেয় সন্দেরবেলা।

—তুলসী রাখিনে তো বাবাঠাকুর। গুরুগোসাঁই ওই পিড়িতেই আছেন।
তুলসী কি হবে?

—তুমি পূজো কর না বুঝি? তুলসী পাতা না হোলে পূজো হয় না।

পাগল ঠাকুর হেসে বললে—হয় বাবা, হয়। কেন হবে না? সব ফুলে, সব পাতাতেই তাঁর পূজো হয়। তবে পূজো-আচ্ছা আমি করিনে বাবা।

—কর না?

—না, বাবাঠাকুর। আমি ছোট জাত, বুনো। তেনার পূজো কি কত্তে পারি আমি? গুরুগোসাই পাবে রাখেন যদি তবে আর পূজোর দরকার কি? ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজো করবে তোমরা—বাঁওনেরা। আমাদের ছোট জেতের হাতে ও সাজে না। পূজো কত্তে নেই আমাদের।

—তুমি তো ভাল লোক।

—কে বললে আমি ভাল লোক?

—সবাই বলে, আমি শুনিচি।

—তুমি যখন বলচো বাবাঠাকুর, তখন ভালই হবো।

এই সময় আমার মাসতুতো ভাই ফিবে এসে আমায় ডাক দিল, তার সঙ্গে আমি বাড়ী চলে গেলাম। বাড়ী যাওয়ার আগে ওরা আমাকে তাল দিলে, শস্য দিলে, আবার আসতে বলে দিলে।

পাগল ঠাকুরের সঙ্গে আমার এই প্রথম দেখার পরে প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেল। মাসিমার বাড়ীর সেই গ্রামে আমাব যাওয়া ঘটেনি এই পাঁচ বছরের মধ্যে।

১৯১৩ সালে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়ে ইস্কুলের বাকি কিছুদিন এড়াবার জন্তে চলে গেলাম আবার মাসিমার বাড়ী।

মাসিমা বললেন—এসো, এসো বাবা। বুড়ো মানীকে ভুলেই গেলে। থাক্—থাক্—বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও।

আমার মনে আছে, ছ'একটা কথার পরে আমি বুড়ীকে জিগ্যেস করলাম - মাসিমা, সেই পাগল ঠাকুর আছে তো?

মাসিমাকে বুড়ী বল্লাম বটে কিন্তু তিনি সত্যিকার বুড়ী এখনও ঠিক নন। যৌবনে তিনি সুন্দরী ছিলেন। আমি যখনকার কথা বল্চি তখনও তিনি তত মোটা হন নি, বেশ দোহারা, স্ঠাম চেহারা, ফর্সা রং, বড় বড় চোখ। মাথার চুল কেবল ছোট ক'রে ছেঁটেছিলেন বিধবা হওয়ার পর। দেহে জরার আক্রমণের কোনো চিহ্ন তখনো স্পষ্ট গুঁঠে নি। তার ওপর মাসিমা ছিলেন গ্রাম্য জমিদারের ঘরের বধূ। চাল চলনে একটা সেকলে বনেদি ও স্পর্শ-ভীকু ঈষৎ গর্বিত আভিজাত্য সদা-সর্বদা বর্তমান থাকতো। মাসিমা তাচ্ছিল্যের স্বরে বলেন—কে? ও সেই পাগল ঠাকুর—হ্যাঁ, বেঁচে আছে। কেন, তার খোঁজে তোমার কি দরকার?

এখানে 'তোমার' কথাটার প্রয়োগ যে বিরক্তিমূচক তা আমার বুঝতে দেবী হোল না। মাসিমা জমিদারের বাড়ীর বৌ। তাঁর বোনপো যে তাঁদেরই গ্রামের এক ছোট জাতের গুরুর সঙ্গে মিশবে এটা তাঁর ভাল লাগলো না। অবিশি এটুকু ও বলা উচিত যে, তাঁরা নামেই তখন জমিদার, কিছুই ছিল না তখন, সংসারে বিষম টানাটানি চলছিল, তাও জানতাম। নতুবা নন্দ জমিদারের ছেলে হয়ে কাঁটান'র হাট থেকে বেগুন বয়ে আনবে কেন ফি হাতে?

মাসিমার প্রশ্নের জবাব দিলাম—আমার কোনো দরকার নেই দেখানে। সেবার আলাপ হয়েছিল, তাই বেঁচে আছে কি না জানতে চাইচি।

—বাঁচবে না তো যাবে কোথায়?

—মেলা হয়?

—পাগল ঠাকুরের মেলা? কেন হবে না, যত বেটা বুনো বাগ্দির গুরুদেব, শুধু ব্যাটার। এসে পায়ের ধুলো নেয়, হৈ হল্লা করে। বাঁটা মারো! গুরু—গুরু! গুরু এমনি গাছের ফল কিনা!

আমি কিন্তু বিকেলেই পাগলঠাকুরের বাড়ী গিয়ে হাজির। সেবারকার সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতি আমার বালক-মনে একটি রহস্যজনক স্থান অধিকার

করে আছে তখনও। আবার তাদের সেই ছুখানা খড়ের ঘর, নিকোনো পুছোনো গোবর-লেপা উঠোন, বিঙের-ফুল-ফোটা গঙ্গার তীরে অপরাহ্ন শোভা কতকাল পরে দেখলুম।

পাগল ঠাকুরের দাড়ি আরও শাদা হয়ে নারদ মূনির মত দেখতে হয়েছে। তবে বার্কিক্যজনিত কোনো শীর্ণত্ব বা দৌর্বল্য নেই শরীরে। খুব শক্ত সমর্থ, লাঠি লাঠি চেহারা। মুখে সেই হাসি। এবার আর আমি নিতান্ত বালক নেই। অনেক জিনিস বুঝি। আগের ভয় আর নেই।

বল্লাম—তোমাকে বড় ভাল লেগেছিল সেবার—বুড় মনে হোত তোমাকে—
হেসে বল্লে—গুরু-গোসাঁইয়ের কৃপা বাবাঠাকুর, তুমি যে পতিতপাবন,
পতিতকে উদ্ধার করতে আসবা না?

—ওসব কথা আমায় বলতে নেই। তুমি আমার নাম মনে রেখেচ যে দেখচি?

—তুমি আমায় মনে বেখেছিলে, তাই আমিও তোমার কথা মনে রেখেছিলাম। আয়নায় মুখ যে বাবাঠাকুর। যেমন দেখাও তেমনি দেখি।

—একটা গান কর—

ওকে আর দ্বিতীয়বার খোসামোদ করতে হোল না। সেবারকাবের সেই বৃদ্ধাকেও দেখলাম এবার। তাকে ডেকে বল্লে—একতারাটা ছাও তো।
পতিতপাবন ঠাকুরকে একটা গান শোনাই—কিন্তু বাবা, একটা কথা বলি?

বলে সে হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলে।

আমি বল্লাম—কি?

ও একটা আলাভোলা, অসহায় ধরণের অনুরোধ যেন করচে, এমনি ভাবে বল্লে—আমি যেমন তোমায় গান শুনিয়ে গেলাম, তুমি পতিত উদ্ধার করতে এমনি ধারা আসবা তো...বলি হ্যাঁ গা? ও ঠাকুর?...

নাঃ, ও পাগলামি শুরু করেছে আবার। কাকে কি বলে যে!

পাগল ততক্ষণ একতারা বাজিয়ে গান শুরু করে দিয়েচে—

ও আমার হৃদ-কমলের পরম গুরু সাঁই,
রেতে আলো দিনে তারা রাত নাই দিন নাই।

তোমার সেথা বাঁশের কাড়ে

অরূপ রূপের পাথার পাড়ে

বাঁশের ফুলে ভুবন আলো দেখতে এলাম তাই।

চলার পথে বাঢ়ল দিনে তোমার সেই

বাঁশতলাতে দিও ঠাঁই,

ও আমার হৃদ-কমলের গরম গুরু সাঁই...:

সেই ছেলেবেলার শোনা গানটা।...ওর গান গাওয়ার ধরণটা আমার বেশ লাগে। চোখ উল্টে উল্টাস নেত্রে ওপর পানে চেয়ে—সে ভাবই আনন্দ। গলা ভাল নয়, ভাঙা গলা, দুটো বেসুরো সুর যেন গলা থেকে বেরিয়ে আসচে—তাই কি, চোখ দিয়ে যখন ওর দরদর জল নেমে এল, তখন আমাদের গ্রামের বিখ্যাত যাত্রার জুড়ি দাসু পরামানিকের চেয়েও ওকে স্ককঠ বলে মনে হোল।

আরও একটা, তারপর আর একটা। সারাটির চরে ঝিঙেফুল ফুটেছিল সেবার, ঝিঙে ফুলের হলুদক্ষেত আর পাগল ঠাকুরের গানের।...পাটে সুর একতারা বাঁধা। ধূ ধূ সরাটির চরে, নির্জন সরাটির চরে ঘুলি ঘুলি আব অন্ধকারে কেউ ঝিঙের ফুল ফুটতে দেখেছিলে ত্রিশ বছর আগের এক ভাদ্র সন্ধ্যায়? তা হোলে পাগল ঠাকুরের গান বুঝতে পারবে।

আমি এক মনে শুনচি। হঠাৎ গান থামিয়ে ও বলে—কি খাবা?

—কিছু না।

—সে বলে হবে কেন? আমারে পেরসাদ দেবে এখন কে?

—আমি খেতে আসিনি তোমার কাছে। তোমাকে দেখতে এসেচি।

পাঁচ বছর পরে এলাম।

পাগল ঠাকুর বিশ্বয়ের স্বরে বলে—পাঁচ বছর হয়ে গেল এর মধ্যে? কি জানি, দিন রাতের হিসেব তো রাখিনি। হ্যাঁ, তা তুমি অনেক বড় হয়ে গিয়েচ বাবাঠাকুর। তখন ছিলে এত বড়—ওগো শোনো—

সেই বুড়ী কাছে এসে বলে—কি বলচো? খোকাবাবু কে?

আমি বললাম—চিনতে পারলে না? সেই এসেছিলাম পাঁচ বছর আগে? নন্দর মাসতুতো ভাই, আমার নাম পতিতপাবন।

—বাবাঠাকুর, বড় খুশি হলাম তুমি এয়েচ। আর চোখে ঠাণ্ড হয় না আগেকার মত। ভালো আছে?

—হ্যাঁ, তা আছি। এখন ইস্কুলে পড়ি—এবার থার্ড ক্লাসে উঠেচি ফার্স্ট হয়ে।

—তা হবে। তোমাদের সব ভালো হোক, গুরু গোসাঁইয়ের দয়ায় সব নিকরগী হয়ে থাকো।

পাগল ঠাকুর বলে—ঘরে কিছু আছে? বাবাঠাকুরের সেবায় লাগাও।

আমার দুর্বল প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেবা লাগানোর কাজে এল একটি পাকা পেঁপে। আমি খাচ্ছি, ও হাত পেতে বালকের মত স্বরে অথচ নারদ মুনির মত দাড়ি নিয়ে আমার ঠাকুরদাদার বয়সী লোক নিঃসঙ্কোচে বলে—গাও একখানা।

দিলাম। যেন আমার সমবয়সী খেলুড়ে। বললাম—তোমার এখানে থাকতে ভালো লাগে।

পাগল ঠাকুর হেসে বলে—তোমাকেও যে আমার রাখতি ভাল লাগে। থাকবা এখানে?

—ইচ্ছে তো করে। বাড়ীর লোকে থাকতে দেবে না যে।

পাগল ঠাকুর একটা মাটির পাত্র থেকে গুড় তুলে নিয়ে দা-কাটা তামাক মাথলে বসে বসে। একটা কন্ধে ভরে তামাক সেজে হাতে করেই টানতে লাগলো। নিজেই একটা হাঁড়ি চড়ালে উঠানের এক উলুনে।

আমি বললাম— হাঁড়িতে কি হবে ?

—বাবাঠাকুর, খিদে পেয়েছে, কিছু খাবো। ছোটো চাল দিয়ে ঘাও গো—

হাঁড়িতে একখুঁচিটাক মোটা বাগা আউশ চাল ফেলে দিয়ে একটু পবে বড় বড় গোটকতক পাকা যজ্জিডুমুর সামনের জঙ্গলের থেকে পেড়ে নিয়ে আঠা স্কন্ধুই ফেললে হাঁড়িতে। আমি বসে বসে ওর খাওয়ার মজা দেখছি। ও আবাব আমার পাশে এসে তামাক খেতে লাগলো। আমার বল্লে—বাবাঠাকুর, ওপারের বুনোপাড়া উচ্ছরে গেল ওলাউঠোতে। রোজ সেখানে ঘাই, সারা দিন থাকি, এই খানিকটা আগে এইচি, তাই বড় খিদে পেয়েছে।

—সেখানে কি কব ?

—আমি কি কিছু করি ? তিনি—গুরু-গোসাঁই কবান। যাদের কেউ নেই, আমার অকেজো হাত দিবে তিনি তাদের মুখে জল দেন, শুষ্ক দেন। আমার হাত ধল হয়ে গেল, আমার হাত না নিয়ে অলু কাবো হাত নিলেই পাবতেন। তেনাব কৃপা।

—গুরু-গোসাঁই কে, আজ বলতে হবে।

—ওই যে উনি—নিরাকাব, সব ঘটে আছেন যিনি। তাই তুমি আমার পতিতপাবন ঠাকুর। তুমিও যা, তিনিও তা—তোমার মধ্যেই তিনি। যাবা রুগী, ওলাউঠোয় বসি করচে, হলদে হয়ে গিয়েচে চোখের শিব, হাতে পায়ে খিঁচুনি ধবেচে, গলা ঘডঘড করচে—তাদের মধ্যে জনায় জনায় তিনি। তিনি উকি মারেন ওদের চোখের মধ্যে থেকে। বেশ দেখতে পাই—বসি ঘাঁটি, ঘেন্না আসে না, মনে হয় গুরু-গোসাঁইয়ের সেবা করচি। খেলা, সব তাঁর খেলা। তাঁর আবার রোগ ! লীলা !

—আমায় নিয়ে যাবে বুনোপাড়ায় ? তোমার সঙ্গে যাবো।

—ওরে বাবা রে ! অমন কচি সুন্দর নতুন হাত বসি ঘাঁটবার জন্তে নয়।

তার এখন দেবী আছে, ও সবেৰ জন্তে তাড়াতাড়ি কি ? পড়ো, এখন খুব মন দিয়ে পড়ো ।

একটু পরে ও ভাত নামালে । একটা আঙট কলার পাতে ঢেলে যজ্জিডুমুরগুলো টিপে টিপে নুন তেল দিয়ে মাখলে । আমার বল্লে—কিছু মনে কোরো না বাবাঠাকুর, আমি খাই ? হুকুম করো—

আমার অনুমতির প্রয়োজন কি, বুঝলাম না । তবু বল্লাম—বারে, খাও, আমি কি বলবো ? খাও—শুধু ডুমুর ভাতে ভাত খেতে পারবে ?

—কেন পারবো না, বাবাঠাকুর । একটা যা হয় হোলেই হোল । জিবের সুখ যত বাড়াবে, ততই বাড়ে । ওর মধ্যে কিছু নেই । কে হাট-বাজারে ছোট্টে ছোট্টো খাওয়ার জন্তে ? জঙ্গলে গুরু-গোসাঁই সব করে রেখেচেন । ডুমুর আছে, তেলাকুচো ফল আছে—

আমি আশ্চর্য হয়ে বল্লাম—তেলাকুচো ?

—হ্যাঁ বাবাঠাকুর, তেলাকুচো ভাতে খাও, ভাজা খাও, তেলাকুচোর পাতা ভাজা খাও—দিক্ৰ জিনিস । পেয়ারা ভাতে ভাত খেয়ে একমাস কাটিয়ে দিই । উঠোনে ওই ঠাখো পেয়ারা গাছ । পেয়ারা হয়নি, তা'হলে তোমায় দিতাম । কেন যাবো বলো হাটে-বাজারে ?

—তোমার উঠোনে তরি-তরকারি কর না কেন ?

—বড্ড খাটতে হয় ওর পেছনে । ঝঞ্জাট । কে অত ঝঞ্জাট করে ? সে সময়টা গুরু-গোসাঁইয়ের নাম নিলে কাজ হবে । ওই শস্যর গাছ করা হয় শুধু গুরু গোসাঁইয়ের সেবার জন্তে ।

পাগলঠাকুর খেয়ে উঠে এঁটো পাতা ফেলে দিলে । রাজ্যির কুকুর জড়ো হয়েছিল আগে থেকে, পাতের অনেকগুলো ভাত ওদের সামনে ছড়িয়ে দিলে ।

আবার তামাক সাজতে বসলো । তামাক খেতে খেতে বুড়ীকে বল্লে—পাকাটি ঠাও গোটাকতক, একটা মশাল করি ।

আমি বললাম—কি হবে ?

—এখুনি আবার বুনোপাড়ায় যেতে হচ্ছে। দুটো রুগী এডিনে আছে, দেখে এসেচি। তাদের ফেলে থাকতে পারবো না। নবীন ডাক্তারকে বলে এসেচি যাবার জন্তে। এখন গুরু-গোসাঁইয়ের কৃপা হোলে সেরে উঠতে পারে। আর তিনি যদি চরণে টানেন—তবে হয়েই গেল—আহা-হা !

ওর চোখে প্রায় জল এসে পড়লো। আমার হঠাৎ বড় উদ্বেগ হোল ওর জন্তে। ও যেন আমাব আত্মীয় কত কালেব। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বহাম—তুমি যেও না সেখানে। যদি তোমার হয় ? বড় খারাপ বোগ—

পাগল ঠাকুর হেসে বললে—ওই ছাখো, বাবাঠাকুরের কথা—তাঁর নিদে সব। তাঁর যদি ইচ্ছে হয় এই খোলসটা বদলাবো, তবে তাই হবে। তিনি যেখানে নিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে যেতেই হবে। আমি তো যাচ্ছি নে, তিনি নিয়ে যাচ্ছেন—তাই যাচ্ছি। আমি কেউ নই।

একটা অদ্ভুত ভাব ওর মুখে ফুটে উঠলো কথা কটা বলবার সমব। বুড়ী বললে—রাত্রিরে ফেরবা তো ?

ও বললে—তা বলা যায় না। তুমি ঝাঁপ খুলে রেখো, আমি তো ঝাঁপ খুলে ঢুকবো। চলো বাবাঠাকুর, সন্দে হয়েচে, তোমায় পৌছে দিয়ে ওহ পথে চলে যাই।

আমি বললাম আমায় এগিয়ে দিতে হবে না, একাই যেতে পারবো, কারণ মাসিমা টের পেয়ে যাবেন যে আমি এতক্ষণ কোথায় :ছিলাম। তিনি পছন্দ করবেন না আমাব এখানে আসা যাওয়াটা। মনে মনে তা আমি জানি। সুতরাং কথবেলতলা দিয়ে একাই বাড়া চলে গেলুম। মাসিমাকে পাগল ঠাকুরের কথা কিছু বলিনি। তিনি নিজেই জিগ্যেস করলেন—ওদিকে গিইছিলি নাকি ?

—কোন্ দিকে ?

—পাগল ঠাকুরের আখড়ায় ?

—হ্যাঁ। একটু বসেছিলাম। বেশ ভালো লোক। কোথায় কলেরা হয়েছে, নিজে গিয়ে তাদের সেবা করচে রাত্তির বেলাতে।

—হুঁ।

ঐ পর্য্যন্ত। উনি চুপ করে গেলেন, বুঝলুম না রাগ করলেন কিনা।

তার পরদিন আবার বিকেলে পাগলের আখড়ায় গিয়ে হাজির হই। কিসের একটা টান অনুভব করলাম, না গিয়ে থাকা গেল না।

পাগল ঠাকুর আপন মনে বসে গান করছিল একখানা তালপাতার চেঁটাই পেতে। ওর গানই ওর উপাসনা, ওর মুখে গান শুনলেই আমার তা মনে হযেচে। আমার বয়েস কম হোলেও আমি তখন অনেক বুঝি। ওর মত ভক্তি আমি কারো দেখিনি। মাসিমাকে বাড়ী ফিরে কথাটা আঁম বলেছিলাম। মাসিমা গীতা নিয়মিত পাঠ করতেন, রামায়ণ মহাভারত তাঁর বড় প্রিয় ছিল, ব্রত উপবাস করতেন, রোজ ভোরে গঙ্গাস্নান করে পূজো-আচ্চা করতেন বেলা ন'টা পর্য্যন্ত। কৃষ্ণ ঠাকুরের ছবিতে চন্দন মাখাতেন, ফুল দিতেন। পাগল ঠাকুর ওসব কিছু করে না অথচ সে ভক্ত লোক, এ কথা মাসিমা বুঝবেন না। তবুও মাসিমা মন দিয়ে কথাটা শুনলেন, শুনে চুপ করলেন।

পাগল ঠাকুরকে বললাম—কখন এলে কাল রাত্তিরে ?

—সারা রাত ছিলাম বাবাঠাকুর। ছুটোই মারা গেল, শ্মশানে গেলাম তাদের ভাসিয়ে দিতে।

—পোড়ালে না ?

—গরীব লোকদের পোড়াচ্ছে কে বাবাঠাকুর! কাঠকুটো কোথায় ? গুরুগোসাঁইয়ের নামে গঙ্গার বুকে ভাসিয়ে দিলাম—আর ভাবনা কিসের ? দেহটা হাঙ্গর কুমীরে খেলেও দেহ দিয়ে জীবের উপকার হোল। পুড়িয়ে দিয়ে ফল কি, বলো ? ওদের একটা ছেলেকে নিয়ে এলাম আমার এখানে। ওই

গাখো, কাঠ কুড়িয়ে আনচে, ছোট ছেলে, কেউ নেই—গুরুগোসাই তাই আমার ঘাড়েই চাপালেন। তাঁর হুকুম।

ও এমনভাবে কথা বল্চে যেন ভগবান ওর সঙ্গে পরামর্শ করেন সব কথা, আমার হাসি পেল। যা হোক, ওর মন ভারি সরল।

আমাকে ওই পাগল ঠাকুর ভয়ানক বেঁধেচে, ক্রমে বুঝি। বিকেল হোলে আসতেই হবে যেন ওর এখানে। ও আমাকে কিছু খেতে দেবে, তারপর গান শোনাবে। কোন বৈষয়িক কথা ওর মুখে শুনিনি। অনেক পরে বয়েস হোলে এ সব ভালো করে বুঝেছিলাম।

আমি বললাম—তুমি মাছ ধর ?

—না, বাবাঠাকুর।

—তোমার বাড়ী কোথায় ছিল ?

অন্য লোক হোলে এ কথার উত্তর দেয় না। কিন্তু পাগল ঠাকুরের মত সরল লোকের কোন কিছুই গোপনীয় নেই। সে বললে—শঙ্করপুর। কাঁচড়াপাড়ার ওদিকে, এখান থেকে আট ন' কোশ।

—বাড়ী-ঘর আছে সেখানে ?

—কিছু নেই। আমরা গরীব লোক, খড়ের কুঁড়ে ছিল, ভেঙে গিয়েচে, ভিটেতে কিছু নেই—মস্ত এক তালগাছ হয়ে আছে, সেবার দেখে এসেছিলাম।

—আপনার জন কেউ নেই ?

—এই যে বাবাঠাকুর, তুল কথা বলে। আপনার জন নেই কেন, এই তুমিই তো আমার আপনার জন। গুরু-গোসাই সবাইকে আপন করে দিয়েচেন যে! ক'দিন থাকবা ?

—আর দুদিন ছুটি আছে মোট।

—মোট দু দিন ? তারপর চলে যাবা ? দুঃখ দিতে আসা কেন বলো

তো। তুমি চলে গেলে আমার বড্ড কষ্ট হবে দিন কতক। বিকেলটা কাটবে না। গুরুগোসাঁইয়ের ইচ্ছে।...

বলে সে দীর্ঘশ্বাস ফেললে। সেই মুহূর্তে ও আমার বড় কাছে এসে পড়লো, আর দূরের লোক রইল না।

বাকি দুদিনও রোজ বিকেলে ওখানে যাই। বুনোদের সেই ছোট ছেলে এবই মধ্যে নিজের হয়ে গিয়েচে। সে দেখি রান্নাঘরে আউশ চালের পান্ত ভাত আর বেগুন পোড়া আপনিই হাঁড়ি থেকে বেড়ে নিচ্ছে দিব্যি। নিজের ঘরের মত।

পাগল ঠাকুর আমায় নিয়ে ছোট ঘরের দাওয়ায় বসে আর গান করে। একতারা বাজিয়ে ওর বেসুরে গলায় যখন গান করে, তখন প্রতিদিন এই গঙ্গার চরে যেন কোন বিরাট দেবের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি...ওদিকে বিষ্ণুপুর গ্রামের কাশবন, দোষপাড়ার বাবুদের লিচুবাগান—সব কেমন অদ্ভুত মনে হয়, সরাটির চরের কাশবনের পেছনে মস্ত আকাশটা লাল হয়ে ওঠে অস্ত-সূর্যের আভায়।

আমার অল্প বয়েস বলেই হোক বা যে জন্মেই হোক, কি অদ্ভুত টান যে হয়ে উঠেছিল পাগল ঠাকুরের ওপর! এখন মনে ভাবলে আশ্চর্য্য হই। বাল্যের সে কয়টি দিনের আনন্দ আর ফিরে পাবো না, তেমন ধরণের আনন্দও আর পাইনি কখনো।

পাগল ঠাকুর গান থামিয়ে একতারা নামিয়ে রেখে একগাল হেসে বলে— আনন্দ করো, আনন্দ করো, আনন্দ করবার জন্মেই এই একপাশে পড়ে আছি। গুরু-গোসাঁইয়ের দয়ায় শুধু আনন্দ নিয়ে আছি।

ওর হাসিভরা উজ্জল চোখ দু'টি আর নারদের মত সাদা দাড়ি, শিশুর মত সরল মুখ ওর কথার সত্যতা সপ্রমাণ করতো...সেই আনন্দ ছোঁয়াচে রোগের মত পেয়ে বসতো সবাইকে, যে ওর সংস্পর্শে আসতো।

এর একটা উদাহরণ মধ্যে একদিন প্রত্যক্ষ করলাম। কোথা থেকে একদল

মেয়ে-পুরুষ ওর ওখানে এল। বোঁচকা বুঁচকি এক একটা পিঠে বাঁধা।
শুনলাম ওরা পাগল ঠাকুরের শিষ্য। ওই যে মাসিমা বলেন, ছোট
জেতের গুরু।

কিন্তু গুরুর মত সস্ত্রমস্চক ব্যবহার করে ওরা দূরে রইল না। সবাই
একসঙ্গে বসে তামাক খেলে হাতে হাতে কন্ধে পরিবেষণ করে। পাগল
ঠাকুরের চারদিকে গোল হয়ে বসে একতারা বাজিরে গান করলে, হাসিখুশি,
আনন্দ, খাওয়া দাওয়া। ওদের মুখ দেখে মনে হোল জীবনে ওদের কোন
দুঃখকষ্ট নেই। খাওয়া দাওয়া তো ভারি, পাগল ঠাকুরের ভাঙার কারো আপন
নয়, যার খুশি নিজের হাতে চাল বার করে নিচ্ছে, বুনোপাড়া থেকে দুটো রাঙা
শাকের ডাঁটা নিয়ে এল, ডুমুর পাড়লে—চড়ালে ভাত, নুন ছড়িয়ে সবাই আঙুট
কলার পাতায় ভাত ঢেলে এক সঙ্গে খেলে, গুরুও বাদ গেলেন না। দিনটা
আনন্দ করে সন্ধ্যের দিকে সবাই বেঁ চকা বুঁচকি নিয়ে চলে গেল।

আমিও চলে এলাম তার পরের দিন।

এরপরে আবার সে গ্রামে যাই যেবার ম্যাট্রিক পাস দিয়ে কলে। ঢুকেচি।
...মাসিমা আগের চেয়ে বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন, চোখে ভাল দেখতে পান না।

বললাম—পাগল ঠাকুর বেঁচে আছে ?

মাসিমা বলেন—আছে না তো যাবে কোথায় ? তোমার বুঝি সেখানে
যাওয়া চাইই—আহা-হা, কি যে দেখেচ ওর মধ্যে তুমি ! ছেলেবেলা থেকে
দেখে আসচি এই কাণ্ড—

পাগল ঠাকুরকে অল্প চোখে দেখলাম। সেই ছোট খড়ের ঘরের আশ্রম,
সেই সদানন্দ সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ, সব তেমনি আছে। চার বছর আগের মত
চেহারাও আছে, বিশেষ কোনো পরিবর্তন নেই। আমাকে দেখে বলে—
বাবাঠাকুর যে ! আরে, এসো, এসো, তোমার কথা কত বলি। কবে এলে ?

—আজই। তুমি ভাল আছ ?

—গুরু-গোসাঁইয়ের কৃপায় আছি ভালোই। বসো, গান শোনবা ?

—গান শোনবার জন্তেই তো আসা।

—শসা খাবা না ছেলেবেলাকাল মত ?

—না, শোনো, এখন আর ছেলেমানুষ নই। তুমি যা খুশি খেতে দিতে পারো, ভাত পর্যন্ত। ছেলেমানুষ নই আর, কারো এস্তাজারির মধ্যে নেই এখন। তোমার এখানে খাবো, তাতে দোষ কি ? রাঁধো না তেমনি ডুম্ব ভাতে ভাত ?

পাগল ঠাকুর ভয়ে ভাণ কবে হেসে বল্লে—ও বাবারে, বাঁওনের জাত মেরে দিই এই সন্দেবেলা। তা হবে না—আব কি খাবা বলো ? ওগো শোনো ইদিকে—এঁকে চেনো ? সেই যে—

বুড়ী কুঁজো হয়ে পড়েচে আরও, চোখেও ভাল দেখে না মনে হোল। কাছে এসে বল্লে—কে ?

—ওই সেই যে ভূপেন বাবুদের বাডীব ছেলেটি কতবড় হয়েছে আব কি চমৎকার দেখতে হয়েছে ছাখো। শোনো, ছটো চাল আব কাঁটাল বীচি ভাজা ভেজে নিয়ে এসো তো, খেতে দিই। চা খাও বাবাঠাকুর ? চা করে দিতে পারি। একজন এখানে চা রেখে গিয়েচে, সে মাঝে মাঝে এসে চা খায়। খাবে ?

—করো।

চা করতে গিয়ে ওরা ছ'জনে বিষম বিপদে পড়লো। বুড়ো-বুড়ী নানা পরামর্শ করে, একবার জল ফোঁটায়, আবাব নামায়—আধঘণ্টা হয়ে গেল, রান্নাঘর থেকে বেরোয় না। কাঁসাব ঘটীতে গবম জল আর চা একসাথে গুড় সহযোগে সিদ্ধ করে অবশেষে এক ব্যাপার করে নিষে এল, সবাই মিলে অর্থাৎ তিনজনেই মহা আনন্দে তাই পান করা গেল।

তারপর তামাক সাজতে সাজতে বলে—এইবার কি খবর বলো বাবাঠাকুর—

—তোমায় দেখতে এলাম।

—আমায় কি আর দেখতে আসবা? ভালোবাসো তাই; নইলে আমি কি একটা দেখবার মতো লোক?

—জানো, তোমাকে একজন দার্শনিক বলে মনে হয়?

—সে কি বাবাঠাকুর?

—আমার মনে হয় তুমি একজন দার্শনিক। সত্যিকার দার্শনিক—ঋষির মত লোক। তোমাকে লোকে চেনে না।

—ওসব কথা আমায় বলো না। আমাকে তিনি পায়ে দাস করে রেখেছেন। তাঁর দয়া। আমার কোন গুণ নেই, বাবাঠাকুর। আনন্দে রেখেছেন, আনন্দে আছি। গান শোনো—

আমার চোখ অনেকটা খুলেচে আগেকার চেয়ে। বুদ্ধের সরল পবিত্র মুখভাব আর সহজ আনন্দ ও'কে আমার চোখে ঋষির পদবীতে উঠিয়ে দিয়েচে।

পাগল ঠাকুর যদি ঋষি নয় তবে ঋষি কে? লেখাপড়া জানলে, আর দু'তিন হাজার বছর আগেকার ভারতবর্ষের লোক হোলে এই লোকে: উপনিষদ রচনা করতো—সরাটির চরের মত উদার হোত তার বাণী, ঝিঙে ফুলের সৌন্দর্য থাকতো তার ভাষায়, সন্ধ্যার সকালে বাঁশবনের পক্ষীকূজনের মত শান্ত সহজ আনন্দ মিশিয়ে থাকতো তার অঙ্গে অঙ্গে।

কিন্তু এ'কে কেউ চিনলে না।

আমার সারা জীবন ওর দত্ত সহজ আনন্দের মত্তে দীক্ষিত। যেবার বিবাহ করি, মাসিমা'কে নববধূ দেখাতে গিয়েছিলাম ওঁদের গ্রামে, ভেবেছিলাম পাগল ঠাকুরের ওখানেও নিয়ে যাবো, আসল উদ্দেশ্য ছিল সেটাই—কিন্তু পাগল ঠাকুরকে আর দেখতে পাইনি।

সেও এক বিকেলে গেলাম ওর আখরাতে। বাবলা গাছের তলায় ওর

সমাধি। ওদের সম্প্রদায়ে নাকি সমাধি দেওয়াই নিয়ম। মাটির একটা লম্বা টিবি, বাবলাফুল ঝরে ঝরে পড়েচে তার ওপর। কোনো শিষ্য কতকগুলো দোপাটি ফুলের গাছ রোপণ করে দিয়েচে মাটির টিবিটার চারিপাশে—পাগল ঠাকুরের নশ্বরদেহের হাড় ক'খানা ওরই তলায় মাটি গুড়ি দিয়ে আছে।

ওকে এখানকার কেউ চিনলে না। আমার মাসিমা তো এত গীতা পাঠ করেন, মন্ত্র জপ করেন, তিনিই বলেন—হ্যাঁ বাপু, তোমার সেই পাগল ঠাকুর আজ বছর দুই হোল কি তিন হোল মারা গিয়েচে। কে জানে, ওসব ছোটলোকের খবর রাখিনে. রাখবার সময়ও পাইনে—সেই বুড়ী কেবল বেঁচে আছে আজও। তাকে সন্ধ্যের পিদিম জ্বালতে দেখলাম সমাধির সামনে। রেডির তেলের মাটির পিদিম। খডের ঘবেব খড উড়ে পড়েচে। আখড়ার অবস্থা অতি খারাপ, কারো দৃষ্টি নেই এদিকে মনে হোল। সংসারে এমনিই হয়।

—শেষ—

